—প্রকাশক—

স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ

২১১, রাসবিহারী এভিনিউ

বালিগঞ্জ, কলিকাতা —১৯

—পুস্তক প্রাপ্তির স্থান—

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

প্রধান কার্য্যালয়—২১১, রাসবিহারী এভিনিউ,

বালিগঞ্জ, কলিকাতা—১৯ ফোন নং—৪৬-১১৭৮

বাঁকুড়া সেবাশ্রম—কেন্দুয়াডিহি, বাঁকুড়া

পুকুরিয়া সেবাশ্রম—পুকুরিয়া, (ঝাড়গ্রাম) জেলা—মেদিনীপুর

মালদহ সেবাশ্রম—সাহাপুর, সিউড়ী সেবাশ্রম, সিউড়ী

গয়া, কাশী, পুরী, নবদ্বীপ, এলাহাবাদ প্রভৃতি তীর্থকেন্দ্র।

মহেশ লাইব্রেরী—২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীগুরু লাইব্রেরী—২০৪, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা

মুদ্রক :

এশিয়ান প্রিন্টার্স

পি-১২, সি. আই. টি. রোড,

কলিকাতা-৭০০ ০১৪

বাইণ্ডিং

বসু বাইণ্ডিং ওয়ার্ক্‌স

২৩, রাজ চন্দ্র সেন লেন

কলিকাতা—৯

উৎসর্গ

এ-দেহের যিনি প্রাণ,

এই জীবনের যিনি জীবনী-শক্তি ;

যিনি প্রেরণারূপে অন্তরে থাকিয়া

জীবন-সাধনার পথে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন,

বুদ্ধিরূপে যিনি সর্ব্বদা

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছেন,

বিবেকরূপে প্রতিনিয়ত যিনি

লক্ষ্যপথে পরিচালনা করিতেছেন ;

এই জীবনের যিনি ধ্রুবতারা, জীবন-তরণীর যিনি কাণ্ডারী,

সেই পরমারাধ্য অন্তর-দেবতা

শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতার শ্রীচরণে

জীবন-সাধনার এই অকিঞ্চিৎকর অর্ঘ্য

"জীবন-সাধনার পথে"

পরম ভক্তিভরে

উৎসৃষ্ট হইল।

★

শ্রীশ্রীসঙ্ঘ-গীতা

"শ্রীশ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজীর ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক উপদেশপূর্ণ অমূল্য পত্রাবলী ও সঙ্ঘ সাধকদের প্রতি আদেশ নির্দ্দেশাদি সংগ্রহ করিয়া এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে।...এই গ্রন্থপাঠে নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। অলস উদ্যমহীন জীবন্মৃত ব্যক্তির হৃদয়ে মৃতসঞ্জীবনী ঢালিয়া দেয়। ...আমরা ধর্ম্মজীবনেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রকেই ইহার এক এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়া নিত্য পাঠ করিতে অনুরোধ করি।"

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতার পরম করুণা ও আশীর্ব্বাদে "জীবন-সাধনার পথে" প্রকাশিত হইল।

সঙ্ঘনেতা শ্রীমদাচার্য্যদেব লেখককে জীবন-গঠন সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত মূল্যবান উপদেশ দান করিয়াছেন এবং দৈনন্দিন জীবনের গতিপথে সাধনা ও কর্ম্মের, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া লেখকের জীবনে তাহার যে জীবন্ত ভাষ্য রচিত হইয়াছে, তাহারই কিয়দংশ দিনলিপি হইতে ভাষায় রূপায়িত করিয়া ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মাসিক মুখপত্র "প্রণব" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তখন কয়েক-খানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক সাগ্রহে লেখাগুলি নিজ নিজ পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত করেন এবং সুধী, সাধক ও 'প্রণবের' পাঠকগণের মধ্যেও অনেকেই উহা পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানাইতে থাকেন। আমরা তাঁহাদের আন্তরিক আগ্রহে উৎসাহিত হইয়া নানা প্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও **"জীবন-সাধনার পথে"** নাম দিয়া লেখাগুলি প্রকাশে ব্রতী হইলাম। জীবন-পথের পথিকগণের পথচলার পক্ষে এই পুস্তিকা কিঞ্চিন্মাত্রও সহায়তা করিলে আমরা আমাদের শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' প্রবীণ মনীষী ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া পুস্তকের সারগর্ভ ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাদিগকে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ প্রার্থনা করি। ইতি—

শ্রীশ্রীদোল-পূর্ণিমা
১৪ই ফাল্গুন, ১৩৫১ সাল

প্রকাশক

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতার অপার কৃপায় 'জীবন-সাধনার পথে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। কিঞ্চিদধিক এক বৎসরের মধ্যেই প্রথম সংস্করণটি সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হওয়ায় আমরা ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে উৎসাহিত হইয়াছি। বর্ত্তমান সংস্করণে কয়েকটি নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে। আশাকরি, প্রথম সংস্করণের ন্যায় এই সংস্করণটিকেও জনসাধারণ সাদরে গ্রহণ করিবেন।

ইতি—**প্রকাশক**

শ্রীশ্রীদোল পূর্ণিমা—২৩শে ফাল্গুন, ১৩৫৩ সাল

তৃতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতার আশীর্ব্বাদে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হইল। ইহাতে শেষের দিকে পরিশিষ্টে সর্ব্বসাধারণের প্রার্থনার সুবিধার জন্য অনুবাদসহ কয়েকটি প্রার্থনার মন্ত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

গত বৎসর এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডি, পি, আই মহোদয় পুস্তকখানাকে ছাত্রছাত্রীদের দ্রুত পঠনের জন্য পাঠ্য হিসাবে অনুমোদন এবং বর্ত্তমান বর্ষে উচ্চ বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রিগণ পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচন করায় আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

পৌষ সংক্রান্তি—২৯শে পৌষ, ১৩৫৭ সাল।

ওঁ

চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন

শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতার অহৈতুকী কৃপায় চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে 'দিনচর্য্যা' শিরোনামায় জীবন গঠনের সহায়ক কতিপয় নিয়ম নূতন সংযোজিত হইয়াছে।

বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, পুস্তকখানা শুধু বাঙ্গালীদেরই সমাদর লাভ করে নাই, বাঙ্গলা ভাষাভিজ্ঞ অবাঙ্গালীরাও ইহাকে বিশেষ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। বিহারের প্রবীণ জননায়ক ও সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামপ্রকাশ লালজী ও অন্যান্য অনেকে পুস্তকখানা পাঠ করিয়া আকৃষ্ট হন। তাঁহাদের আগ্রহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সম্প্রতি ইহার হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও মনীষিগণ কর্তৃক আদৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, আমেদাবাদের প্রসিদ্ধ গুজরাটী দৈনিক 'সন্দেশ' পত্রিকায় এই গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে এবং গুজরাটী বন্ধুগণের আগ্রহে সঙ্ঘের সুরাট কেন্দ্র হইতে ইহার গুজরাটী অনুবাদ প্রকাশনের ব্যবস্থাও হইতেছে। বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষাব্রতী মনীষী ও অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণ ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন-গঠনোদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পুস্তকখানা পঠন-পাঠনের ব্যাপক ব্যবস্থা করিতেছেন। সাধারণ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার সমূহেও ইহা যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে।

আজ স্বাধীন ভারতে ভারতীয় শিক্ষা-সাধনা-সংস্কৃতি ও আদর্শের মহীয়ান্ ভিত্তিতে বলিষ্ঠ মানুষ ও জাতি-গঠনের সহায়করূপে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বশ্রেণীর মানুষ কর্তৃক-পুস্তকখানা অধিকতর আগ্রহ ও আন্তরিকতার সহিত গৃহীত এবং বহুলভাবে প্রচারিত হউক—ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। ইতি—

পূর্ণিমা

২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ সাল। প্রকাশক

সূচীপত্র

—:*:—

গ্রন্থ-পরিচিতি

ডক্টর শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ-ডি

ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘের সহ-সম্পাদক শ্রীমৎ আত্মানন্দ স্বামীজী-প্রণীত "জীবন-সাধনার পথে" গ্রন্থখানি পড়িয়া নিরতিশয় তৃপ্তি লাভ করিলাম। বর্তমান যুগে জড়বাদ ও সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার অতি-প্রাদুর্ভাবের জন্য জীবনকে গভীরভাবে অনুভব করিবার প্রবৃত্তি দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। যে কোন উপায়ে অর্থোপার্জ্জন, ভোগবিলাসের পরিতৃপ্তি ও লঘু আমোদ-প্রমোদের আস্বাদন মানব-জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতা বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। সমস্ত জীবন যে একটা দুরূহ ব্রতের সাধন ও উদযাপন এই সত্য আমরা ক্রমশঃ ভুলিতে বসিয়াছি। এই অবস্থায় স্বামীজীর এই গ্রন্থখানি বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকার ভাবের গভীর আন্তরিকতা ও প্রকাশ-ভঙ্গীর উদাত্ত ওজস্বিতার সহিত মানবজীবনের কর্ত্তব্য ও আদর্শের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। যে সমস্ত গুণের বিকাশ না হইলে প্রকৃত মনুষ্যত্বের স্ফুরণ অসম্ভব, গ্রন্থকার সেই সমস্ত গুণের অনুশীলন সম্বন্ধে অতি সরল ও আন্তরিকতা-পূর্ণ ভাষায় আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। এই নৈতিক উপদেশের পশ্চাৎপটে আছে প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস ও ভগবানের প্রতি আত্ম-নিবেদন—এই পিছনের প্রতিষ্ঠানভূমিই শুষ্ক নৈতিকতার মধ্যে উচ্চতর কাব্যোৎকর্ষ ও ভাব-গভীরতার সুরের সঞ্চার করিয়াছে। লেখক যে প্রকৃতই গুরুর আসনে অধ্যাসীন হইবার যোগ্য, তাহা প্রমাণ হইয়াছে তাঁহার আত্ম-জিজ্ঞাসার পরিচ্ছেদগুলিতে। তিনি কেবল উপদেষ্টার উচ্চমঞ্চ হইতে পরকে উপদেশ দেন নাই—অন্তর্মুখী দৃষ্টিবলে নিজ ত্রুটি অপূর্ণতা

সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন ও ভগবানের করুণা ও প্রসাদ যাচ্ঞা করিয়া প্রকৃত শক্তির উৎসের সহিত নিজ সংযোগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া মনে একটা প্রশ্ন জাগে। আমাদের দেশে ধর্ম ও সমাজশক্তি যখন সজীব ছিল, তখন এরূপ প্রত্যক্ষ নীতি-উপদেশের সেরূপ আবশ্যকতা ছিল না। যে দেশে রামায়ণ রচিত হইয়াছে, সে দেশের লোককে পিতৃভক্তি সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিতে হয় না। যেখানে সমাজ কর্মনিষ্ঠ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আদর্শপরায়ণ সেখানে সমাজের প্রভাব ও দৃষ্টান্তই নীতি-উপদেশের স্থান অধিকার করে। বিশুদ্ধ আবহাওয়ায় মনকে সরস রাখিলেই আপনা-আপনি সুস্থ ধর্ম্মবোধ অঙ্কুরিত হওয়া স্বাভাবিক। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে প্রতিবেশের সহজ হিতকর শক্তি আজ অনেকাংশে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। দেশের আকাশ-বাতাসে আজ জীবনীশক্তি-বর্দ্ধক উপাদান এত প্রচুরভাবে পরিব্যাপ্ত নয় যে, সহজ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেই আমরা উহাকে গ্রহণ করিতে পারি। আজ দেশের সংস্কৃতির ঐক্য বিধ্বস্ত; নূতন নূতন মতবাদের দুষ্ট বীজাণু আমাদেব সহজ বুদ্ধিকে আজ ক্লিষ্ট ও নীরক্ত করিয়া তুলিয়াছে; বিপরীতমুখী আকর্ষণ আজ আমাদিগকে আমাদের চিরন্তন প্রতিষ্ঠাভূমি হইতে কোন অন্ধ রসাতলের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কাজেই আবার প্রচারকের প্রয়োজন হইয়াছে, পরিচিত সত্যগুলি আমরা জীবনে বিস্মৃত হইতে চলিয়াছি, সেগুলির মহিমা আবার ঘোষণা করিতে হইতেছে। রোগের প্রতিষেধক ঔষধ ব্যবহার করিতে হইতেছে। আজ ব্যাধিজর্জ্জর সমাজে এই হিতকর ঔষধের প্রয়োজনীয়তা আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতে বাধ্য। ইতি—

শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা

—জাতি-সংগঠক—

আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ

ওঁ

জীবন-সাধনার পথে

মিনতি

পশ্চাতে অনাদি অতীত, সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যৎ ; মাঝে এতদুভয়ের সংযোগসেতুরূপে ক্ষণিক "বর্ত্তমান" প্রতিনিয়ত তিলে তিলে পলে পলে অজ্ঞাত ভবিষ্যতের বুক চিরিয়া দিন রাত্রি ছুটিয়া চলিয়াছে অবিরাম অবিশ্রাম দুর্নিবার গতিতে। জীবনের ঘনঘোর কুজ্ঝটীকাময় অন্ধকারাচ্ছন্ন এই দুর্গম পথে, হে প্রেমময় প্রভো! তুমিই আমার আশ্রয় অবলম্বন ; বিপদে-আপদে, সম্পদে-নিরাপদে তুমিই একমাত্র সহায়, সুহৃদ, আত্মীয়, আপনার জন। শুধু তাই নয়, এই জীবন-তরণীর তুমি গতি-মুক্তি, তুমি পরিণাম-পরিণতি, তুমিই কাণ্ডারী।

হে দয়াময়! জীবনের এই বিঘ্ন-সঙ্কুল সুদীর্ঘ গতিপথে যদি দুর্ব্বল প্রাণমন আমার শ্রান্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে, তবে তোমার স্নেহসিক্ত অমৃত পরশ বুলাইয়া দিও। অজ্ঞান অহংএর প্রমত্ত অহমিকায় উন্মত্ত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধিবশে যদি কখনও তোমার নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া বিপথে ছুটিয়া যাই, তবে হে করুণানিধান! তুমি আমায় ত্যাগ না করিয়া তোমার কাছে ফিরাইয়া লইও। আমি অবোধ জীব, শিশু সন্তান তোমার ; আমার শত অপরাধ, সহস্র দোষত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া তোমার শ্রীচরণে স্থান দিও। প্রলোভনের কুহকে ভুলিয়া, তোমার পবিত্র স্মৃতি

বিস্মৃত হইয়া যদি পাপের পিচ্ছিল পথে পড়িয়া যাই, তবে হে জীবন-নাথ! করুণা করিয়া তুমি একবার তোমার সুকোমল কোলে তুলিয়া লইও। দুর্বিবসহ জ্বালামালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া অন্তর যদি ছাই হইয়া যায়, সুতীব্র যাতনা-বেদনায় জীবন যদি কখনও দুর্ব্বহ হইয়া উঠে, তবে তোমার সুশীতল করস্পর্শে অন্তরের সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া শান্তি ও সান্ত্বনা দিও।

কি আর বলিব নাথ! তুমি অন্তর্য্যামী, আমার অন্তরের নিভৃত চিন্তা-তরঙ্গ, নিতান্ত গোপনীয় ভাবসমূহ সমস্তই তুমি আমার চেয়েও বেশী জান। তাই তোমার শ্রীচরণে শেষ মিনতি—জীবনে-মরণে, শয়নে-স্বপনে এই দেহ-মন-প্রাণ দ্বারা যেন তোমারই ইচ্ছা সাধিত হয়, দৈনন্দিন জীবনের প্রতি নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসটি যেন নিঃসঙ্কোচে তোমারই আদেশ পালনে ব্যয়িত হয়। প্রাণের সকল তারে আজ তোমারই দিব্য রাগিণী ঝঙ্কারিয়া উঠুক, সমস্ত হৃদয় আজ তোমারই জয়গানে পরিপূর্ণ হউক, জীবনের এই প্রথম যাত্রা-পথে তোমার আশ্রিতের এই ক্ষীণ কণ্ঠ মহোল্লাসে তোমার অপার মহিমা বিঘোষিত করুক।

ওঁ তৎসৎ হরিঃ ওঁ।

জীবন-লক্ষ্য

ক্ষুদ্র বীজের ভিতর যেমন মহামহীরুহের বিরাট কায়া আত্মসঙ্কোচ করিয়া লুক্কায়িত থাকে, তেমনি এই ক্ষুদ্র মানুষের ভিতরও আত্মসঙ্কোচ করিয়া ঘুমাইয়া থাকে তাহার অনন্ত শক্তিমান ভূমা আত্মা। অপরিস্ফুট সঙ্কুচিত কোরকের বুকে সুপরিস্ফুট পুষ্পের সৌন্দর্য্যসুষমার আত্মগোপনের মত এই ক্ষুদ্র অবিকশিত মানবশিশুর ভিতরেই মহামানবের অপূর্ব্ব মহত্ত্ব ও দেবোপম চরিত্রমাধুর্য্য আত্মগোপন করিয়া থাকে। এই সঙ্কুচিত ঘুমন্ত মহান্ আত্মসত্তাকে জাগ্রত করিয়া মানুষের বিরাট সম্ভাবনাকে সুপরিস্ফুট সুপরিণত রূপ দেওয়াই জীবনের চরম সার্থকতা। মানুষ যখন তাহার বিরাট ভূমাস্বরূপকে উপলব্ধি করে, তখন সে আর দ্বন্দ্বমোহগ্রস্ত, কামনা-বাসনা-তাড়িত, রিপু-ইন্দ্রিয়-শাসিত, রোগ-শোক-কাতর, মরণ-ভীরু দুর্ব্বল মানুষ নয়, তখন সে দুঃখ-শোক-মোহাতীত, জরাব্যাধিমুক্ত, রিপু-ইন্দ্রিয়-শাসক মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীর। জগতের কোন শক্তি তখন তাহাকে শাসন করিতে পারে না, কোন প্রলোভন তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে সক্ষম হয় না, কোন দুঃখ-দৈন্য, অসুখ-অশান্তি, পাপতাপ, ভয়-ভাবনা নিকটে আসিতে সাহস পায় না; প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটের পদতলে লুণ্ঠিত ভৃত্যের মত সমস্ত বিরুদ্ধশক্তি সসম্ভ্রমে আসিয়া তাহার পদমূলে আশ্রয় ভিক্ষা করে, মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব গঙ্গা যমুনার পবিত্র ধারার মত পরস্পর সম্মিলিত হইয়া তাহার জাগ্রত ভূমাস্বরূপে মিশিয়া সাগর-সঙ্গমের পুণ্যতীর্থ সৃষ্টি করে।

"ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" ভূমা বিরাট মহান্ যাহা, তাহাতেই

সুখ শান্তি আনন্দ ; আর অল্প সামান্য ক্ষুদ্র যাহা, তাহাতেই শোক-দুঃখ-অসুখ-অশান্তি।

"যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্।"

ভূমার ভিতরে মহানের ভিতরে অমৃতত্ত্ব—চির অমরত্বের অক্ষয় বীজ নিহিত, আর অল্প সামান্য সঙ্কীর্ণতার ভিতরেই সুনিশ্চিত ধ্বংস, মহামৃত্যু। অনন্ত শক্তির আধার মানুষ যখন তাহার এই বিরাট স্বরূপ ভুলিয়া, চরম দুর্ভাগ্যবশে জীবনের এক অসাবধান দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে নিজেকে 'অল্পে'র (সঙ্কীর্ণতার)- মধ্যে আবদ্ধ করিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ হয়, তখন সে, শুধু তার আত্মশক্তির অপব্যবহার ও আত্মসত্তাকে লাঞ্ছনা ও অপমানই করে না, মহামৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়া করে চিরঘৃণ্য নির্লজ্জ আত্মহত্যা। যে মানুষ অসামান্য পৌরুষবলে অসাধ্য সাধন করিয়া সমগ্র জগতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করিবার মত শক্তিসম্পন্ন, যার তপোলব্ধ অত্যদ্ভুত বীর্য্যবিভূতি বিশ্বপ্রকৃতিকে আয়ত্তে আনিয়া ইঙ্গিতে পরিচালন করিতে সমর্থ, যাহার সুবিকশিত জাগ্রত ব্যক্তিত্বের বিপুল প্রভাব সর্ব্বধ্বংসী মহাকালকেও অগ্রাহ্য করিয়া জগতের বুকে অক্ষয় আসন প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম, সেই দুর্জ্জয় শক্তির আধার মানুষ যদি তার সমস্ত শক্তি স্বীয় উদরপূর্ত্তি ও নির্দ্দিষ্ট মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকের ভরণ-পোষণে সীমাবদ্ধ করে, তবে তাহা আত্মহত্যা নয় তো কি? যে মানুষ সমগ্র বিশ্বমানবকে শাশ্বত শান্তি ও কল্যাণের অমৃতান্ন পরিবেশনে পরিতৃপ্ত করিয়া চিরন্তন অশান্তির দাবদাহ নির্ব্বাপিত করিবে, সে যদি শুধু ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্ভোগ-চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে তবে তাহা কি তাহার সামর্থ্যের অপচয় নয়? শুধু আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনই

কি জীবনের একমাত্র কাম্য বস্তু? শুধু রিপু-ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব ও পাশবিক বৃত্তির চরিতার্থতায়ই কি একমাত্র তৃপ্তি? একমাত্র সুখ? মানুষ কি কেবল ইহার জন্যই জন্মগ্রহণ করে ও বাঁচিয়া থাকে? না, তাহার জীবনের অন্য কোন শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য, মহত্তর প্রয়োজন আছে? স্বেচ্ছাবিচরণশীল প্রচণ্ড প্রতাপশালী পশুরাজ সিংহের শৃঙ্খলিত জীবনই কি বাঞ্ছনীয়? অনন্ত আকাশে উড্ডীয়মান স্বাধীন বিহঙ্গের পিঞ্জরাবদ্ধ জীবনই কি শান্তিদায়ক? স্বর্ণ-পিঞ্জর, স্বর্ণশৃঙ্খল, অনায়াস-লব্ধ আহার্য্য ও লোকের মনোরঞ্জনই কি তাহার নিকট তৃপ্তিকর? আত্মন! একবার ধীরভাবে, শান্ত মনে, স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করিয়া দেখ।

দাসস্বভাবসম্পন্ন দুর্ব্বল মানুষ বা জাতি যেমন পরাধীনতার অহিফেন সেবন করিয়া স্বাধীন জীবনের শান্তি ও আনন্দ ভুলিয়া যায় এবং পরাধীনতাকেই একমাত্র শান্তির কারণ বলিয়া মনে করে, তেমনি ঐন্দ্রিয়ক সুখ সম্ভোগে মত্ত, মোহাভিভূত মানুষও ইন্দ্রিয়াতীত ভূমার অনন্ত শান্তি-পারাবারের কথা ভুলিয়া একমাত্র ক্ষণভঙ্গুর 'আপাত-মনোরম পরিণাম ভয়াবহ' ভোগ সুখকেই প্রকৃত সুখ বলিয়া ভুল করে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে মহাকালের নির্ম্মম আঘাতে বিষয়সম্ভোগরূপ রঙ্গীন নেশা ছুটিয়া যায়, সদ্যধৃত পাশবদ্ধ কেশরীর মত বদ্ধজীবনের বন্ধন-বেদনায় মানুষ অস্থির চঞ্চল হইয়া উঠে, তখন সেই মুহূর্ত্তে "নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী",—সিংহ যেমন সরোষে পিঞ্জর ভঙ্গ করিয়া মুক্ত প্রান্তরে বাহির হইয়া আসে, ইন্দ্রিয়পাশবদ্ধ মানুষও তেমনি সংসারজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া ত্যাগের পথে—শান্তির রাজ্যে ছুটিয়া আসে,

সর্ব্ববন্ধনমুক্ত স্বাধীন জীবনের নিরবচ্ছিন্ন অনাবিল আনন্দ আস্বাদন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হয়। শুধু তাই নয়, এতদিন সে ভ্রান্তির ঘোরে মোহের বশে যে রিপু-ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিতেছিল, সেই রিপু-ইন্দ্রিয়ই অনুগত ভৃত্যের মত তাহার আদেশ পালন করিতেছে দেখিয়া এবং প্রভু হইয়াও সে যে এতদিন তাহারই ভৃত্যের দাসত্ব করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া বিস্মিত ও লজ্জিত হয়।

আত্মন! সর্ব্বপ্রকার দাসত্ব, পরাধীনতা ও আত্মবিস্মৃতির মোহ-কবল হইতে আত্মোদ্ধার করিয়া অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তোল, ইহার জন্য যত কঠোর মূল্যই প্রয়োজন হউক না কেন তাহা দিতে প্রস্তুত হও। আজ যাহা দুঃসাধ্য বা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাই নিরন্তর সাধনা ও অভ্যাসের ফলে একদিন সুসাধ্য ও সম্ভব হইয়া উঠিবে। তবে ইহার জন্য চাই বিরাট উদ্যোগ, অনন্ত অসীম ধৈর্য্য, অদম্য অফুরন্ত উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায়। জীবনের লক্ষ্য-সাধনায় সিদ্ধ পূর্ব্বতন কৃতী মহামানবদের ভিতর যে শক্তিসামর্থ্য ছিল, তোমার ভিতরেও সেই শক্তিসামর্থ্যই বিদ্যমান। এখন চাই (তাঁদের মত) শুধু সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া সেই শক্তির অনুশীলন, কার্য্য সিদ্ধির উপযোগী কঠোর আত্মত্যাগ, সাধনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ।

সাময়িক দুঃখ-দুর্ব্বলতা বা প্রাথমিক অকৃতকার্য্যতায় হতাশ হইও না। কঠোর প্রতিজ্ঞা ও বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্প সহকারে লক্ষ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও। মনে রাখিও —

জীবন-লক্ষ্য

"উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্‌বিভাগে,
বিকশতি যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখরাগ্রে।
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নিঃ,
ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ ॥"

সূর্য্য যদি পশ্চিম দিকে উদিত হয়, পর্ব্বত শিখরে যদি পদ্ম প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ করে, মেরু পর্ব্বত যদি স্থানান্তরে গমন করে এবং অগ্নিও যদি শীতলতা প্রাপ্ত হয় তথাপি প্রকৃত সজ্জনের বাক্য কখনও অন্যথা হয় না।

—লক্ষ্য-সাধনের এই দৃঢ়তাই মানুষকে সিদ্ধির গৌরব দান করে।

প্রার্থনা

উপাসনা আত্মার খাদ্য, প্রার্থনা প্রাণের অমৃতরসায়ন। জীবনের ঘোর দুর্দিনে, দুঃখ-দৈন্য-অসুখ-অশান্তি-হাহাকারের মাঝে প্রার্থনাই মানুষের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন। অনাহারক্লিষ্ট দুর্ব্বল শরীর যেমন দৈনন্দিন আহারের দ্বারা পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়, তেমনি জন্মজন্মান্তরের বুভুক্ষিত পাপতাপক্লিষ্ট মানবাত্মাও প্রার্থনা দ্বারা সুস্থ, সবল, সজীব ও নূতন তেজে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

বিবিধ ঘাত-সংঘাত, জ্বালা-যন্ত্রণায় যখন হৃদয়-তন্ত্রী ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, বিভিন্ন রকম বিপদাপদ বিষাদ-অবসাদে প্রাণমন যখন ভাঙ্গিয়া পড়ে, প্রাণপাতী পরিশ্রম, চেষ্টা-যত্ন, উদ্যোগ উৎসাহ সমস্তই যখন নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়, হতাশা-নিরাশার নিষ্ঠুর কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া যখন নিতান্ত অসহায়ভাবে শুধু মরণের প্রতীক্ষায় দিন গণিতে ইচ্ছা হয়, তখন—জীবন-মরণ সমস্যার সেই নিদারুণ দুঃসময়ে একটিবার কেবল হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দাও, সমস্ত প্রাণমন ঢালিয়া শ্রীভগবানের রাতুল চরণে আকুল প্রার্থনা নিবেদন কর, আগ্রহ-ব্যাকুল হৃদয়ে সমস্ত অন্তর দিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ, আশ্রয় ভিক্ষা কর, দেখিবে, মুহূর্ত্তের ভিতর যেন কাহার স্নেহশীতল হস্তের স্নিগ্ধ মধুর স্পর্শে অশান্তির দাবানল নিভিয়া গিয়াছে, সমস্ত জ্বালামালা বিষাদ অবসাদ দূর হইয়া অন্তরের গভীরতম প্রদেশে নির্ম্মল শান্তির অনাবিল ধারা ঝির-ঝির করিয়া বহিয়া চলিয়াছে, কে যেন তোমার আঁধার পথ আলো করিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাবিপদ পায়ে দলিয়া আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে।

দাও, আপনাকে সম্পূর্ণ রিক্ত করিয়া, মুক্ত করিয়া, উজাড় করিয়া নিঃশেষে তাঁহার শ্রীচরণে ঢালিয়া দাও, প্রার্থনা ও উপাসনার ভিতর দিয়া তাঁহার সহিত নিরবচ্ছিন্নভাবে যুক্ত হও, অন্তরকে সর্ব্বদা পূর্ণরূপে তাঁহার প্রতি উন্মুখ করিয়া রাখ, তবেই নিমেষের মধ্যে তাঁর কৃপার বৈদ্যুতিক স্পর্শে তোমার হতাশা-বিপর্য্যস্ত প্রাণমন সরল সতেজ হইয়া উঠিবে, তাঁহার অহৈতুক করুণাধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া সমগ্র জীবন-জনম ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া যাইবে।

আদর্শ ও নীতি

আদর্শ ও নীতিই মানুষের জীবনীশক্তি, প্রাণপ্রস্রবণ। প্রত্যেক মানুষ, সমাজ ও জাতি খাঁটি শক্তিমান হয়, সত্যিকার বাঁচা বাঁচিয়া থাকে তাহার শিক্ষা-সংস্কৃতি, আদর্শ ও নীতির অনুসরণের ভিতর দিয়া। যে মানুষ ও যে জাতি যতদিন পর্য্যন্ত তাহার মহান্ আদর্শ ও নীতিকে প্রাণপণে আকড়াইয়া ধরিয়া থাকে ততদিনই সে থাকে জগতের বুকে দুর্জ্জয়, দুর্দ্ধর্ষ, দুরতিক্রম্য, অপরাজেয়। রাষ্ট্রীয় অধিকার স্খলিত হইলেও সতেজ প্রাণশক্তি তাহার দুর্ব্বল হয় না, কঠোর নির্য্যাতন নিপীড়নেও প্রবল জীবনীশক্তি কখনও লোপ পায় না। অটুট প্রাণ-শক্তির প্রাচুর্য্যে, মহান্ শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আদর্শের জীবন্ত প্রভাবে সে মরণজয়ী হইয়া মহাকালের বুকে নির্ভয়ে বীরের মত বিচরণ করে, স্বীয় বিজেতাকে পর্য্যন্ত আদর্শ-সমৃদ্ধ মহাজীবনের মন্ত্রে দীক্ষা দান করিয়া শিষ্যরূপে বরণ করিয়া লয়; জগতের ইতিহাস ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

প্রকৃত মানুষ যে, মহান্ আদর্শ ও নীতিকেই সে জীবনের ধ্রুবতারা বলিয়া গ্রহণ করে। মৎস্য যেমন জলশূন্য হইয়া বাঁচিতে পারে না, প্রকৃত মানুষও তেমনি মহান্ আদর্শ ও নীতি ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হয় না। আদর্শনিষ্ঠ, নীতিপরায়ণ ব্যক্তি এই জন্য যে-কোন বিপদ বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত হয়; কোন অত্যাচার উৎপীড়নকে সে ভয় করে না, লাঞ্ছনা নির্য্যাতনকে গ্রাহ্য করে না, মৃত্যু আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত হাসিমুখে সাদরে তাহাকে আলিঙ্গন করে; কিন্তু জীবনের আদর্শকে কখনও সে পরিত্যাগ করে না। বিদ্যুদ্ঝলসিত, অশনিমন্দ্রিত কাল বৈশাখীর প্রলয়ঝঞ্ঝা মস্তকে ধারণ করিয়া, আততায়ীর গুপ্ত ছুরিকা পশ্চাতে রাখিয়া, শত্রুর শাণিত কৃপাণের মুখে নির্ভয়ে সে আগাইয়া চলে কৃপণের ধনের মত স্বীয় আদর্শ ও নীতিকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া। নিষ্ঠুর নির্য্যাতনের কণ্টক-মুকুট সে সানন্দে মাথায় তুলিয়া লয়, 'সারকে' অন্তরের গোপন অন্তরালে সযত্নে আগ্লাইয়া রাখিয়া অত্যাচারীর কোষমুক্ত উদ্যত তরবারির নিম্নে শির আগাইয়া দেয়।

আদর্শের জন্য মরণ—সার্থক মরণ; সে তো মরণ নয়—অমর জীবন। তাই বিপদের কৃষ্ণমেঘ যতই গাঢ়তর হয়, নির্য্যাতনের নির্ম্মমতা যতই নিষ্ঠুরতর হইতে থাকে, আদর্শের পূজারী নিঠাবান্ সাধকের প্রাণমনও ততই বিপুল উল্লাসে মাতিয়া উঠে। তখন তাহার সেই বজ্রগম্ভীর হুঙ্কারে ভয় ভীত হইয়া পলায়ন করে, মৃত্যু আসিয়া "অন্তহীন প্রাণের" সন্ধান দিয়া বিদায় লয়, তার 'অমর মরণ' (রক্ত-বীজের মত) সহস্র সহস্র আদর্শপরায়ণ নূতন মানুষ সৃষ্টি করিয়া জাতির

জীবনে অফুরন্ত প্রেরণার উৎসরূপে অক্ষয় হইয়া বাঁচিয়া থাকে।

মহান আদর্শের অনুশীলন, উত্তম নীতির অনুসরণ দ্বারাই মানুষ প্রকৃত মহৎ হয়, সমাজ ও জাতি প্রকৃত শ্রেষ্ঠতা অর্জ্জন করে। যে জাতি ও সমাজ যত বেশী উচ্চতম আদর্শসম্পন্ন মহামানব দান করিতে পারে, সে জাতি ও সমাজ মহত্তর নীতি ও আদর্শদ্বারা বৃহত্তম জনসমষ্টিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করিতে সক্ষম হয়, সেই জাতি ও সমাজই সমগ্র জগতের নিকট তত বেশী শ্রদ্ধা ও গৌরব লাভ করিয়া থাকে। জগৎ মানুষের পূজা করে না, পূজা করে মহান্ আদর্শের; জগৎ মানুষকে শ্রদ্ধা দেখায় না, শ্রদ্ধা দেখায় শ্রেষ্ঠ মহত্ত্বকে। আদর্শহীন মানুষ—সে তো গলিত শব, এজগতে কেহ তাহার দিকে ফিরিয়া তাকায় না। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ জন্মে, মরে; কি আসে যায় তাতে? মানুষের মত মানুষ, খাঁটি আদর্শবান পুরুষ একজন জন্মিলে সমগ্র জগতে তোলপাড় সৃষ্টি হয়, জাতির শিরায় শিরায় নব বসন্তের পুলক শিহরণ জাগে, সমাজের বুকে নূতন জীবনের স্পন্দন দেখা দেয়, দিকে দিকে দেশে দেশে মহাভাবের প্লাবন বহিয়া যায়, সমগ্র জগৎ সেই মহান্ ব্যক্তিত্বের শক্তিময় স্পর্শে সজীব হইয়া উঠে। তখন জাতীয় জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়, সহস্রাব্দের ঘুমন্ত জাতি জাড্যজড়তা বিষাদ-অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া নূতন বিক্রমে জীবনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। সমগ্র মানবজাতি নবজন্ম লাভ করিয়া ধন্য হয়!

আত্মন্! প্রকৃত জীবন চাও? তবে স্বীয় আদর্শকে প্রাণপণে আক্‌ড়াইয়া ধরিয়া থাক। মানুষ চিরকাল বাঁচে না, আদর্শই চিরকাল

বাঁচিয়া থাকে। বাঁচিতে হয় তো আদর্শকে নিয়া বাঁচিয়া থাক, মরিতে হয় তো আদর্শ নিয়াই মরিয়া যাও। জীবনে-মরণে, শয়নে-স্বপনে, জাগরণে-বিচরণে আদর্শই তোমার সাথী, নীতিই পরম সুহৃদ, বন্ধু। আদর্শকে তুমি রক্ষা করিলে আদর্শও তোমাকে রক্ষা করিবে, নীতির (Principle) জন্য প্রাণ বলি দিলে শত শত প্রাণ তোমার পশ্চাতে দাঁড়াইবে। সুতরাং বৃথা মোহে মুগ্ধ না হইয়া, ভোগ-মরীচিকার পশ্চাতে না ছুটিয়া আদর্শের সাধনায় আত্মনিয়োগ কর, নীতিকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত কর ; তুমি কৃতার্থ হইবে, সমাজ ও জাতি নবজন্ম, নবজীবন লাভ করিয়া মহীয়ান্ গরীয়ান্ হইয়া উঠিবে। ওঁ শম্।

——:*:——

সঙ্কল্প-সাধনা

সঙ্কল্পই সাধকের জীবন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞাই সঙ্কল্পের প্রাণ। জীবন-পথের তরুণ অভিযাত্রিগণ! আজিকার এই শুভমুহূর্ত্তে—নববর্ষের নূতন প্রভাতে তোমরা তোমাদের জীবনের সঙ্কল্প-মন্ত্রকে আবার নূতন করিয়া ধ্যান কর। স্বর্ণকে যেমন অগ্নিতাপে শোধন পূর্ব্বক মালিন্য দূর করিয়া উজ্জ্বল ও ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে হয়, তেমনি মানুষের অভীষ্টসিদ্ধির সঙ্কল্পকেও প্রতিদিন, প্রতিমাস, প্রতি বর্ষের নবীন ঊষায় ধ্যানদ্বারা অবসাদ ও মালিন্য দূর করিয়া নূতন করিয়া জাগ্রত, জীবন্ত ও কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হয়।

স্বার্থ-কালিমাশূন্য, ইষ্টনিষ্ঠ, শুদ্ধ সাধকের নির্ম্মল হৃদয়ে যে পবিত্র সঙ্কল্প জাগ্রত হয় তাহা কখনও ব্যর্থ বা নিরর্থক হয় না; তাই সিদ্ধি সেখানে সুনিশ্চিত। কিন্তু জড়ের মত নিশ্চেষ্ট বা উদাসীন থাকিলে, অথবা কাপুরুষের মত শুধু ভাবিয়া ভাবিয়া কাল কাটাইলে চলিবে না। ইহার জন্য জীবন পণ করিতে হইবে, সর্ব্ব-প্রকার দুঃখদৈন্যকে বরণ করিয়া লইয়া উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে। "কখনও কোন মুহূর্ত্তে যদি সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইতে হয়, তবে যেন তাহার পূর্ব্বে জীবন-লীলার অবসান হয়"—এমনিতর দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বলে সঙ্কল্পকে সর্ব্বদা সজাগ ও সচেতন রাখিতে হইবে। কেন না, আবদ্ধ ব্রত উদ্‌যাপন, আদর্শ জীবন-সাধনার সঙ্কল্প গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই সাধকজীবনে কঠোর অগ্নি-পরীক্ষা সুরু হয়। চতুর্দ্দিক হইতে বাধাবিঘ্ন, বিপদাপদ আসিয়া সাধককে সঙ্কল্পচ্যুত করিবার জন্য প্রবলবেগে আক্রমণ করিতে থাকে। সময় সময় তাহা এমনি চরমে উঠে যে, সাধকের ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য, এমন কি অস্তিত্ব পর্য্যন্ত দলিয়া পিষিয়া গুঁড়াইয়া ফেলিবার উপক্রম করে। নিদাঘ-মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড যেমন দিবাবসানে ক্লান্ত ও নিস্প্রভ হইয়া পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়ে, তেমনি সঙ্কল্প-সাধনার সাহসী সাধক, জীবন-পথের বীর অভিযাত্রীও সময় সময় আঘাত আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ক্লান্তিভরে এলাইয়া পড়ে। তখন সেই নিদারুণ অবসাদের সময়, জীবনের সঙ্কল্পমন্ত্র বার বার স্মরণ ও গ্রহণ করিয়া, হতাশাচ্ছন্ন দুর্ব্বল মন-প্রাণকে সবল সুস্থ করিয়া বিজয়ী বীরের মত আবার অভীষ্ট সিদ্ধির পথে অভিযান করিতে হয়।

হতাশায় দমিও না, নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িও না, আঘাত আক্রমণে

বিচলিত হইও না। সীতার মত কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, মহাবীর হনুমানের মত দুস্তর-বারিধি অতিক্রম করিয়াই তোমাকে সঙ্কল্পের সাধনায় সাফল্য লাভ করিতে হইবে। সর্ব্বদা মনে রাখিও প্রতিনিয়ত শয়নে, স্বপনে, জাগরণে ধ্যান করিও—প্রহ্লাদের দৃঢ়তা, আর তথাগত বুদ্ধের সেই মহাসঙ্কল্পমন্ত্র—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং,
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প-দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥"

শরীর শুষ্ক হয় হউক, অস্থি-চর্ম্ম-মাংস ধ্বংস হইয়া যায় যাউক, তথাপি সেই বহুকল্পদুর্লভ বোধি (আত্মজ্ঞান) লাভ না করিয়া কিছুতেই আমি এই আসন ত্যাগ করিব না।

এই প্রকার বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্পের বলে ভগবানের আসন টলিয়া উঠে, তিনি স্বয়ং আসিয়া সাধকের কণ্ঠে সিদ্ধির জয়-মাল্য পরাইয়া সঙ্কল্প-সাধনার গৌরব দান করেন।

ইহা শুধু স্তোকবাক্য নয়, সাধক-জীবনে বহুপরীক্ষিত নানাভাবে উপলব্ধ বাস্তব সত্য।

——:*:——

পবিত্রতা

ধর্ম্মজীবন গঠনের জন্য চাই পবিত্রতা—পরিপূর্ণ পবিত্রতা। সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে দেহমন-প্রাণের পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইবে, চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ হইতে হইবে।

পবিত্রতাই মানুষের প্রকৃত জীবন, পবিত্রতাই মানব চরিত্রের যথার্থ ভূষণ, পবিত্রতাই সত্যিকার শান্তি ও আনন্দ; পরিপূর্ণ পবিত্রতার ভিতরেই মানুষের যাবতীয় শক্তিসামর্থ্য, বলবীর্য্য, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বিদ্যমান। সুতরাং জীবন পণ করিয়া এই মহান্ পবিত্রতা-সাধন-ব্রত পালন কর। ধৌত বস্ত্রের মত নিষ্কলঙ্ক হও, শারদ প্রভাতের সদ্যবিকশিত শেফালির মত নির্ম্মল, সুগন্ধি, মনোরম ও সুমনোহর হইয়া সমগ্র দিগ্দেশ তোমার পবিত্র ও মধুরভাবে আমোদিত করিয়া তোল।

সর্ব্বদা জপ কর পবিত্রতা পবিত্রতা, চিন্তা কর পবিত্রতা পবিত্রতা, ধ্যান কর পবিত্রতা পবিত্রতা। এমনি করিয়া নিজের অন্তরে বাহিরে, নিজের চতুর্দ্দিকে এক মহাপবিত্র আবহাওয়া, একটা বিশুদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি কর; আর সর্ব্বদা তাহার মধ্যে অবস্থান করিয়া পারিপার্শ্বিক পঙ্কিলতার আক্রমণ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখ।

যখন যেখানে যাইবে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে একটা পবিত্র পরিমণ্ডল, একটা পবিত্র আবহাওয়া বহন করিয়া লইয়া যাইবে। যখন যাহা কিছু করিবে, এই পবিত্র পরিবেশের ভিতরে থাকিয়া করিবে; তোমরা পবিত্রতার প্রভাবে বাহিরের চতুষ্পার্শ্বস্থ পঙ্কিল আবহাওয়া ও মালিন্যকে (পবিত্রতায়) রূপান্তরিত করিয়া তোমার নিকট হইতে সর্ব্বদা চতুর্দ্দিকে একটা প্রবল পবিত্র ভাবপ্রবাহ প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করিবে।

সর্ব্বদা পবিত্র চিন্তা কর, পবিত্র ভাবনা ভাব, পবিত্র কথা বল, পবিত্র বস্তু দর্শন কর, পবিত্র বিষয় শ্রবণ ও অধ্যয়ন কর, পবিত্র সঙ্গ কর, পবিত্র স্থানে বসবাস কর। পবিত্র জিনিষ গ্রহণ ও পবিত্র খাদ্য আহার কর। এমনিভাবে অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পবিত্রতার সাধনায় নিমগ্ন থাকিয়া যখন তুমি পবিত্রতার জ্বলন্ত-জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি হইতে পারিবে, সর্ব্বপ্রকার মালিন্য ও পঙ্কিলতা যখন বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত হইয়া তোমার নিকট কল্পনারও অতীত হইয়া যাইবে, তখন সেই মহা শুভমুহূর্ত্তে তোমার সেই পবিত্র হৃদয়ে পবিত্রতাঘনবিগ্রহ নিষ্কল নির্ম্মল শ্রীভগবান পূর্ণজ্যোতিতে ভাতিয়া উঠিবেন।

বাক্ সংযম

কাজের সময় অপ্রয়োজনীয় কথা বলিও না। এই জগতে যে যত বেশী অনাবশ্যক কথা বলে, সে-ই তত কম কাজ করিতে পারে। কারণ, অন্তরের যে শক্তি কর্ম্মরূপে পরিণত হইয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারিত, তাহাই বৃথাবাক্য বা বাগাড়ম্বরের ছিদ্র পথে নিঃশেষিত হইয়া মানুষকে অন্তঃসারহীন, অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। উদ্দেশ্যহীন নিরর্থক বাক্যব্যয়ে মানুষের অন্তর ক্রমশঃ চঞ্চল ও দুর্ব্বল হয়; তখন সেই অবস্থায় যে কোন গভীর বিষয়ে মনোনিবেশ বা কোন কঠোর কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারে না। তখন তাহার অনবরতই আত্মবিস্মৃতি ঘটিতে থাকে এবং সে সর্ব্বপ্রকারে নিতান্ত সাধারণ দায়িত্ব-বহনেরও অযোগ্য হইয়া পড়ে; শুধু তাই নয়, নিরন্তর

অনাবশ্যক ও অবান্তর কথা বলার ফলে বিশেষ পদমর্য্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিও এমন হাল্কা হইয়া যায় যে সাধারণ লোকও তাহাকে অশ্রদ্ধা ও উপহাস করে, নিতান্ত আপনার জনও তাহার কথায় কোনও গুরুত্ব আরোপ করে না।

মানুষ যতই ধীর, স্থির ও সংযতবাক্ হইবে ততই তাহার বিচার নির্ভুল, প্রতিভা অম্লান, কর্ম্মশক্তি প্রখর, আত্মস্মৃতি জাগ্রত, বুদ্ধি নির্ম্মল ও কর্ত্তব্যবোধ সজাগ হইবে।

সংযতবাক্ ব্যক্তির কথার ভিতর দিয়া এত শক্তি সঞ্চারিত হয় যে, তাহার অন্যথাচরণ করা অপরের পক্ষে দুঃসাধ্য, এমন কি অসাধ্য হইয়া উঠে। সংযতবাক্ ব্যক্তির প্রত্যেকটি কথা অপরের প্রাণে শক্তির তাড়িৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করে, সম্মোহন শক্তির মত সকলকে মুগ্ধ করিয়া সেই ভাবে কার্য্য করিতে বাধ্য করে। মনে প্রাণে সংযতবাক্ হইতে পারিলেই বাক্‌সিদ্ধি লাভ হয়। তখন মানুষ এত শক্তি লাভ করে যে মানুষ তো সাধারণ কথা, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি পর্য্যন্ত তাঁহার আদেশ অবনত মস্তকে মানিয়া লইতে বাধ্য হয়।

'মা পৃষ্টঃ কস্যচিৎ ব্রুয়াৎ' - জিজ্ঞাসিত না হইয়া কাহারও সহিত কথা বলিবে না। জিজ্ঞাসিত হইলেও অবান্তর কথা এড়াইয়া চলিবে। নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথাও যেটুকু না বলিলে নয়, ততটুকুই অতি ধীর, স্থির ও সংযতভাবে বলিবে। এই জন্য অপ্রয়োজনীয় লোকের সংস্রব হইতে যতটা সম্ভব দূরে থাকিবে। প্রত্যূষে উঠিয়া সংকল্প করিবে যে, আজ এতটি কথা বলিব এবং শয্যা গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত এই সংখ্যা ঠিক রাখিব। এমনি ভাবে শুধু বাহ্যিক নয়, মনে প্রাণে, এমন কি

বা কল্পনায়ও যখন অবান্তর কথা বলার প্রবৃত্তি জাগিবে না, অবান্তর চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনার তরঙ্গ পর্য্যন্তও যখন সম্পূর্ণরূপে তোমার অন্তর হইতে তিরোহিত হইয়া যাইবে,* তখনই তুমি ঠিক ঠিক সংযতবাক্ হইবে; তখন সেই শুভ সময়ে তোমার চিন্তা ও বাক্যের অমোঘ শক্তি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক মহা আলোড়ন সৃষ্টি করিবে—সমগ্র বিশ্ববাসী তোমার মুখের একটি মাত্র কথা শুনিবার জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ হইয়া থাকিবে।

—::—

আত্মশক্তির উদ্বোধনেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব

অন্তর্নিহিত অবিকশিত শক্তির উপযুক্ত প্রকাশ বিকাশ উন্মেষ উদ্বোধনের ভিতরেই মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব, বীরের প্রকৃত বীরত্ব নির্ভর করে। উপযুক্ত সময়ে আত্মশক্তির উন্মেষ উদ্বোধন, আত্মচেতনার প্রকৃত জাগরণ না ঘটিলে অতি বড় বীর, মস্ত বড় মনীষীও নিতান্ত সাধারণ নিজ্জীবের মত কাল কাটাইতে বাধ্য হয়; আর ঘুমন্ত আত্মশক্তি ও চেতনা জাগ্রত হইলে সাধারণ মানুষও মহাবীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া সমগ্র জগৎকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়া তোলে। সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত ক্ষুদ্র মানুষই স্বীয় উদ্বোধিত শক্তির

* জীবনের মহান্ আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনায় তন্ময় এবং সাধনায় একনিষ্ঠ হইতে পারিলে ধীরে ধীরে এই অবস্থা লাভ হইতে থাকে।

বলে দুর্লঙ্ঘ্য গিরিশৃঙ্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া, দুস্তর কানন-কান্তার মরু-প্রান্তর অতিক্রম করিয়া প্রচণ্ড তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ অপার বারিধিবক্ষে ভাসমান হইয়া অসাধ্য সাধন করে; জরামৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া মহাকালের উপর পর্য্যন্ত প্রভুত্ব করার মত সামর্থ্য লাভ করে। সরিষাপ্রমাণ ক্ষুদ্র বীজের ভিতরে যেমন মহামহীরুহের বিরাট সম্ভাবনা আছে, তেমনি এই জরাব্যাধি-প্রপীড়িত নরমানুষের ভিতরেও অসাধ্য সাধনের অনন্ত শক্তি ও চির অমরত্ব লাভের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে। কুসুম-কোরক যেমন দৈনন্দিন সাধনায় ধীরে ধীরে ক্রমশঃ নিঃশব্দে আপনার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য সুষমাকে বিকশিত করিয়া উপযুক্ত সময়ে সমস্ত দিগ্দেশ আমোদিত করিয়া তোলে, মানুষও তেমনি দৈনন্দিন জীবন-সাধনা, চেষ্টা-যত্ন-উদ্যম-অধ্যবসায় দ্বারা স্বীয় অবিকশিত শক্তির বিকাশ সাধন করিয়া সমগ্র জগৎকে মহদ্ভাবে উদ্বোধিত করিতে পারে। কিন্তু মানুষ সেই বিরাট সম্ভাবনার কথা ভুলিয়া, আত্মবোধ ও আত্মচেতনা হারাইয়া নির্জ্জীবের মত নিতান্ত সাধারণ ভাবে, হীনভাবে জীবন ও জনম নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে!

"এই যুগ মহাজাগরণের যুগ, মহামুক্তির যুগ।" এখন আর মানুষকে নিতান্ত অসহায় নির্জ্জীবের মত ঘাত-সংঘাত ও অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইলে চলিবে না। তার ঘুমন্ত সত্তাকে জাগ্রত করতঃ জীবনের বিরাট সম্ভাবনাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। **আজ চাই মানুষের সুপ্ত আত্মচেতনার পুনরুদ্বোধন - মহাজাগরণ।**

আত্মনিবেদন

দিন যায়। জীবন তো নিরন্তর মরণ-সিন্ধুপানে ব'য়ে যায়। কিন্তু প্রভো! আজও তোমার জীবনে বরণ করে নিলাম কই? আন্তরিক প্রেম-প্রীতি-অনুরাগ, ভক্তি-শ্রদ্ধা-ব্যাকুলতা নিয়ে তোমার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করলাম কোথায়?

জীবননাথ! দুঃখ-দৈন্য-দুর্বিবপত্তি যখন শ্রাবণের ধারার মত অবিরাম মাথার উপর ঝরেছে, অসুখ-অশান্তি, হতাশা-নিরাশা যেদিন দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত জীবন-পথ রুদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়েছে, পঙ্কিল কামনা বাসনা ও প্রলোভনের প্রবল প্রবাহ যখন আমায় ভাসিয়ে নেওয়ায় উপক্রম করেছে, তখন তুমিই তো করুণাপরবশ হয়ে স্নেহাকুল জননীর মত সাদরে কোলে তুলে নিয়েছ।

হে করুণানিধান! তোমার নির্দ্দেশ অবহেলা ক'রে, অহংকার অভিমানে মত্ত হ'য়ে যখন বিপথে ছুটে গিয়েছি, তখন তুমিই তো ব্যস্ত হ'যে ত্রস্ত পদে এগিয়ে গিয়ে আমায় ফিরিয়ে নিয়ে এসেছ। আবিলতা, পঙ্কিলতা যখন আমায় চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে, স্তূপীকৃত পাপতাপ, পুঞ্জীভূত জঞ্জালজাল যখন জীবনকে দুর্ব্বহ ক'রে তুলেছে, তখন হে আমার প্রিয়তম! তুমিই তো তোমার সুকোমল স্নেহশীতল কর সঞ্চালনে সমস্ত জ্বালামালা জুড়িয়ে আমায় শান্তি ও সান্ত্বনা দিয়েছ!

কত আর বলবো, হে আমার দয়িত! কত শত বার বৃথা মোহে মুগ্ধ হ'য়ে তোমাকে হৃদয়াসন থেকে নির্ব্বাসন কোরে অন্যের জন্য

সাগ্রহে আসন পেতে দিয়েছি, কত সহস্রবার প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-করুণা বিস্মৃত হ'য়ে মায়া-মরীচিকার পিছনে ছুটে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। কিন্তু তবুও তো তুমি আমায় কখনও ভুলোনি, বিশ্বাসঘাতক বলে অবিশ্বাস ক'রে ঘৃণাভরে (আমায়) দূরে তাড়িয়ে দাও নি। হে আমার প্রিয়তম! চিরকালই তুমি আমায় সমস্ত প্রবঞ্চনা প্রতারণা, সমস্ত অনাদর অশ্রদ্ধা উপেক্ষা ক'রে সাদরে কোলে টেনে নিয়েছ, চির-কালই তুমি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা ক'রে, সমস্ত দোষত্রুটি ভুলে গিয়ে "এই চির অপরাধী পাতকীর বোঝা" হাসিমুখে ব'য়ে চলেছ!

কিন্তু হায়! তবুও আমি তোমায় বুঝলাম কই? বুঝেও সমস্ত প্রাণমন দিয়ে দরদ করলাম, ভালবাসলাম কই? তুমি যে আমার, আমি যে তোমার, সকলের চেয়ে বেশী আপনার"—একথা সমস্ত হৃদয় দিয়ে নিবিড়ভাবে অনুভব করতে পারলাম কোথায়? বুঝে না বুঝে অনভীপ্সিত পথে চলে প্রতিনিয়ত তোমার ঐ স্নেহকোমল হৃদয়ে কত না আঘাত করেছি, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, স্বেচ্ছায় পরেচ্ছায় কত শত বারই না তোমার ঐ দরদভরা বুকে মর্ম্মান্তিক শেল হেনেছি। কিন্তু তবুও তুমি অকৃতজ্ঞ আমায় স্নেহালিঙ্গন দানে কুণ্ঠিত হও নি।

তাই, হে আমার অন্তরতম! আজ 'এই অবেলায়' তোমায় সেই ভুবনভুলান, প্রাণগলান, মনমাতান অপরূপ রূপমাধুরী স্মরণ ক'রে তোমার অহৈতুক স্নেহ-করুণা, আদর-যত্ন-ভালবাসার দাবী নিয়ে তোমায় শ্রীচরণে উপস্থিত। আমার গর্ব্বিত মস্তক তোমার চরণধূলার তলে লুণ্ঠিত হয়েছে, সমস্ত অহঙ্কার অভিমান চোখের জলে ধুয়ে মু'ছে গেছে, আমি আজ "সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া তোমারই দুয়ারে

এসেছি," অশ্রুসিক্ত মৌন বেদনার অর্ঘ্য নিয়ে তোমারই করুণার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছি।

লও, লও, হে জীবননাথ! হে হৃদয়-স্বামীন্! আজ আমায় পূর্ণরূপে তোমার করে লও। তোমার ও আমার মাঝে যে আড়াল, যে ভেদ ও ব্যবধান রয়েছে তা' চিরতরে দূর করে দাও। 'আমি' ও 'আমার' বল্‌তে যত কিছু সব নিঃশেষে 'তুমি' ও 'তোমার' মাঝে ডুবে যাক, আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রাণমন এক সুরে গেয়ে উঠুক—

"All Thine is mine
and all mine is Thine."

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব॥"

——:*:——

জাগরণী

উদ্বুদ্ধ হও, জাগ্রত হও, জীবনের মহত্তম দায়িত্ব, শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য সাধনের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হও। সর্ব্বপ্রকার ক্লৈব্য-দৌর্ব্বল্যকে বিসর্জ্জন দিয়া, আবিলতা পঙ্কিলতাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া, মোহ ও আত্মবিস্মৃতিকে দূরে পরিহার করিয়া বীরের মত উঠিয়া দাঁড়াও। জীবনের পথ বড় বন্ধুর, বড় বিপদসঙ্কুল, ঘাত-সংঘাত, অবস্থাবিপর্য্যয় সেখানে নিত্য-সাথী, দুঃখ-দৈন্য, অসুখ-অশান্তি, বিষাদ-অবসাদ, হতাশা-নিরাশা

সেখানে মানুষের নিত্যসহচর। বাধাবিঘ্ন পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়, সংশয় সন্দেহ অবিশ্বাস আদর্শের প্রতি অনাস্থা জাগাইয়া সাধন-জীবনের মূল ভিত্তি চুরমার করিয়া দেয়, পঙ্কিল কামনা বাসনা ও বিষয়-ভোগাকাঙ্খা আসিয়া শক্তি-সামর্থ্য-বলবীর্য্য অপহরণ করিয়া মানুষকে নির্জ্জীব পঙ্গু করিয়া ফেলে, বিভ্রম-বিভ্রান্তি ও বিস্মৃতি আসিয়া তাহাকে আদর্শভ্রষ্ট, লক্ষ্যচ্যুত করিয়া বিপথে ভুলাইয়া নিয়া যায়। জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষময় এই দারুণ দুর্য্যোগে, আত্মবিস্মৃতি ও আদর্শবিভ্রাটের এই বিষম সংকটে, হে মুমুক্ষু সাধক! তুমি স্বীয় প্রজ্ঞাবলে আত্মবোধ ও আত্মশক্তিকে জাগ্রত করিয়া নূতন উৎসাহে বুক বাঁধিয়া বীর বিক্রমে জীবনের লক্ষ্যপানে অগ্রসর হও। নৈরাশ্য ও নিশ্চেষ্টতাকে দূরে সরাইয়া দিয়া তুমি প্রকৃত পৌরুষ অবলম্বন কর।

প্রকৃত সাধক যে, সে-ই প্রকৃত বীর। তাহার আবার দুঃখ-দৈন্য অসুখ-অশান্তি-বিষাদ-অবসাদ লইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিবার অবসর কোথায়? যুধ্যমান বীর সৈনিক যেমন সংগ্রামক্ষেত্রে বিরুদ্ধ-পক্ষীয় অনলবর্ষী কামানের মরণমুখে দণ্ডায়মান হইয়া রণোল্লাসে মাতিয়া উঠে, জীবন-পথের বীর অভিযাত্রী খাঁটী সাধকও তেমনি জীবনের মহান্ সংগ্রামক্ষেত্রে দুঃখ-দুর্ব্বিপত্তির প্রলয় ঝঞ্ঝার ভিতরে মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বীর বিক্রমে গর্জ্জিয়া উঠে। আঘাতের পর আঘাত আসে, বিপদের পর বিপদ দেখা দেয়, বিরুদ্ধবাদীর কোষমুক্ত শাণিত তরবারি শিরোপরি উদ্যত হয়, কিন্তু সাধক তবুও নিশ্চল, নির্ভীক; কোন দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁর উন্নত শির ক্রমশঃ উন্নততর হয়, ভাবগম্ভীর প্রশান্ত মুখমণ্ডল উৎসাহের দীপ্ত আলোকে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে, সে

মহানন্দে বিপদের সুখশয্যা রচনা করিয়া আরামে, পরম নিশ্চিন্ত মনে তাহাতে বিশ্রাম করে, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা ধরিয়া অমৃতের দুর্গম পথে আগাইয়া চলে। ইহাই তাহার চলার ভঙ্গী।

আত্মন্! দুর্দ্দিনের ঘন ঘোর বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত হইও না, সংগ্রামের ভয়ে দূরে সরিয়া পড়িও না, চরম শ্রেয়ের পথে অভিযান করিয়া শান্তি লাভ কর, আর উৎকর্ণ হইয়া শোন শ্রুতির সেই বজ্রগম্ভীর বাণী— চিরজাগরণী—

"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

—ঃঃ—

দায়িত্ব

কর্ত্তব্য-সাধনে পশ্চাৎপদ হইও না, কোন বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কখনও নিশ্চেষ্ট থাকিও না। কর্ম্মক্ষেত্রে যত সময় তুমি (যে বিষয়ের) দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আছ, তত সময় প্রাণমন ঢালিয়া বীরের মতই তাহা উদ্‌যাপন করিতে থাক। কেন না, নিতান্ত আপনার জনও কর্ম্মক্ষেত্রের দোষত্রুটি ক্ষমা বা উপেক্ষা করে না।

কৈফিয়ৎ দ্বারা কখনও আপনার অক্ষমতার সাফাই গাহিতে যাইও না, স্বীয় অসুখ-অসুবিধার কথা জানাইয়া অকৃতকার্য্যতার কারণ দর্শাইও না। কারণ, কর্ম্মক্ষেত্রে সকলেই চায় কাজ, কেহই কৈফিয়ৎ চায় না। কর্ম্মক্ষেত্রে দোষত্রুটি পাইলে, অক্ষমতা, দুর্ব্বলতা বা বিচারের ভুল দেখিলে কেহ কাহাকে ছাড়িয়া দেয় না, সহানুভূতি দেখায় না। নিতান্ত

স্নেহাস্পদ যে, সে-ও তোমার দায়িত্ব উদ্‌যাপন করিতে না পারার উপযুক্ত কোন কারণ ছিল কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখিবে না, বরং অক্ষমতার কৈফিয়ৎ শুনিয়া একটু করুণা বা বিদ্রূপের হাসি হাসিবে। সুতরাং সহানুভূতি লাভ বা দোষ-ক্ষালনের আশায় অপরকে তোমার দায়িত্ব উদ্‌যাপন করিতে না পারার কারণ জানাইয়া বৃথা উপহাসাস্পদ হইও না। তাহাতে তোমার কোন লাভ বা কর্ত্তব্যসাধনের কোন সাহায্য তো হইবেই না; বরং অসুবিধা হইবে যথেষ্ট।

দুনিয়া বীরের পূজা করে, শক্তিমানের কথা শুনে, সবল সচেষ্ট ব্যক্তিকে সাহায্য করে, সহানুভূতি দেখায়। এই জগতে অক্ষম, দুর্ব্বল, নিশ্চেষ্ট ব্যক্তির কোন স্থান নাই; কেহ তাহাকে সাহায্য করে না; নিতান্ত আপনার জনও তাহার দিকে ফিরিয়া তাকায় না। তাই পড়িতে পড়িতে উঠিয়া দাঁড়াও, মরিতে মরিতে কর্ত্তব্য কাজ করিয়া যাও, জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি, শরীরের শেষ রক্তবিন্দুটি পর্য্যন্ত গৃহীত দায়িত্ব উদ্‌যাপনের জন্য ব্যয় করিতে প্রস্তুত হও। দেখিবে, তোমার নিরলস চেষ্টা-যত্ন, তোমার অপ্রতিহত উৎসাহ-উদ্যম-অধ্যবসায়, তোমার আন্তরিক ও ঐকান্তিক আগ্রহ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠাই তোমাকে সহস্র বিফলতার মধ্যে সাফল্যের বিজয় মুকুট পরাইয়া দিবে।

জগৎ সব সময় শুধু কাজের পরিমাণ বা ফলাফল দেখিয়াই মানুষকে বিচার করে না, বিচার করে তাহার কার্য্যসাধনার আন্তরিকতা, তার আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা-যত্ন ও ঐকান্তিকতার পরিমাণ দেখিয়া। তোমার অটুট কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, তীব্র দায়িত্ববোধ, প্রাণপাতী পরিশ্রম-প্রচেষ্টা, অবিচল ধৈর্য্য ও তিতিক্ষাই অপর সকলের ভিতর রূপ পরিগ্রহ করিয়া

এমন এক উৎসাহপূর্ণ পরিবেশ ও বিপুল কর্ম্মপ্রবাহ সৃষ্টি করিবে, যাহাতে পর্ব্বত-প্রমাণ বাধাবিঘ্ন অপসারিত হইয়া গুরুতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য অনায়াসেই সম্পন্ন হইয়া যাইবে। মনে রাখিও—গৃহীত দায়িত্ব উদ্‌যাপনের জন্য চরম বিপদকে বরণ করিয়া যখন তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মূল্য দিতে প্রস্তুত হইবে, তখনই ভগবানের আসন টলিবে, তখনই তাহা অপরকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিবে। আর সঙ্গে সঙ্গে জানিয়া রাখিও—তীব্র দায়িত্বজ্ঞানের ভিতর দিয়াই মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হয়, কর্ত্তব্য-সাধনার জন্য চরম বিপদকে বরণ করার ভিতর দিয়াই মানুষ মহীয়ান্ গরীয়ান্ হইয়া উঠে; মরণের ভিতর দিয়াই সত্যকার জীবন আসে, মৃত্যুর দ্বারেই অমৃতত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, দধীচির মত চরম ত্যাগ ও আত্মদানের মধ্য দিয়াই মানুষ চির অমরত্ব লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হয়। ওঁ শম্

—ঃ০ঃ—

আঘাত-আক্রমণ

(নিজের প্রতি)

জীবনের পথে অনেক আঘাত-আক্রমণ সহ্য করিয়া মানুষকে বড় হইতে হয়। এই জন্য নাকে কাঁদিয়া অপরের উপর দোষারোপ করিলে বা অস্থির হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। বীরের মত আক্রমণ-কারীর সমস্ত ভ্রূভঙ্গী উপেক্ষা করিয়া কঠোর দৃঢ়তা সহকারে দুর্দ্দমনীয় তেজে স্বীয় আদর্শের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। সমস্ত বাধা-বিপত্তি

অতিক্রম করিয়া একবার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারিলে দেখিবে, যাহারা প্রথমে তীব্র বিদ্রূপ ও কঠোর সমালোচনার তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাঘাতে তোমাকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছিল, তাহারাই তোমার প্রশংসায় মুখর হইয়া সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিতেছে ; ইহাই জগতের চিরন্তনী রীতি। অসহায়ের আকুল ক্রন্দন, দুর্ব্বলের মর্ম্মন্তুদ হাহাকার এ জগতে কাহারও কর্ণে প্রবেশ করে না। যতদিন তুমি ছোট থাকিবে, দুর্ব্বল থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিক হইতে বিরুদ্ধ শক্তি আসিয়া নিষ্করুণভাবে তোমাকে দলিয়া পিষিয়া মারিয়া ফেলিতে উদ্যত হইবে। কিন্তু যখনই তুমি বড় হইবে, সবল শক্তিমান হইয়া জীবন-সংগ্রামে যথোচিত বীরত্বের পরিচয় দান করিবে তখনই সকলে তোমাকে বিজয়মাল্য পরাইয়া সাদরে বরণ করিয়া লইবে।

জগৎ শক্তির পূজারী, শক্তিমানের শ্রেষ্ঠ আসন সকলের শিরোপরি প্রতিষ্ঠিত। অতি বড় বিরুদ্ধবাদীও শক্তিমানকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করে। কিন্তু অসহায়, অক্ষম ও দুর্ব্বলকে নিতান্ত সহানুভূতিশীল সমবেদনাপরায়ণ ব্যক্তিও অনেক সময় সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় না, তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও ব্যর্থ হইবে ভাবিয়া।

সর্ব্বপ্রকারের দুর্ব্বলতা ও ভীরুতাকে ঝাটাইয়া দূর করিয়া দাও, আদর্শের সাধনায় প্রকৃত শক্তি ও সাহসের পরিচয় প্রদান কর, দেখিবে, কেহ তোমাকে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করিতে পারিবে না। সকলের সমস্ত আঘাত, আক্রমণ, লাঞ্ছনা, অপমানের যোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়া হইবে তখনই যখন তুমি নিজেকে উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে যথার্থ শক্তি, সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিতে পারিবে। নিজে যতই নির্ভীক ও শক্তিমান্ হইতে পারিবে, সমস্ত আঘাত আক্রমণের

প্রতিরোধ ও প্রতিকার তখনই সম্ভব হইবে। অন্যথা শুধু জীবনের তিক্ততাই বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু সত্যিকার প্রতিকার কিছু হইবে না।

আত্মন! এ জগতে শক্তিহীনতার কথা জানাইয়া কাহারও সাহায্য চাহিও না, স্বীয় অক্ষমতার কথা নিবেদন করিয়া কাহারও দয়া ভিক্ষা করিও না। কারণ নিজের অসহায় ও দুর্ব্বল অবস্থা জানাইয়া যতই অন্যের করুণা উদ্রেক করিতে চাহিবে, ততই করুণার পরিবর্ত্তে কেবল ঘৃণা ও লাঞ্ছনার মাত্রাই বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং জীবন-পথে কাহারও কৃপাপ্রার্থী না হইয়া, একমাত্র ভগবানকে সহায় করিয়া জয়যাত্রা সুরু কর, আর তাঁহার দানকেই মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া লইয়া সানন্দে বল—

"ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অচল রবো ;
দুঃখে আমার বক্ষে তব বাজবে জয়ডঙ্ক,
দেবো সকল শক্তি, লব অভয় তব শঙ্খ।"

তাহা হইলে স্বীয় যোগ্য স্থান, যোগ্য মর্য্যাদা অধিকার করিয়া লইতে পারিবে।

——ঃঃ——

মাভৈঃ

দুর্জ্জয় সাহস ও অবিচলিত আত্মবিশ্বাসই জগতে অসাধ্য সাধন করিয়া থাকে। আকাশ যদি মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়ে, সুমেরু যদি পথ রুদ্ধ করিয়া দাড়ায়, মৃত্যুও যদি সম্মুখে আগাইয়া আসে, মাভৈঃ!

জীবনের মহান্ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান বীর সৈনিক তুমি, পিছনে হটিবার আদেশ নাই, গন্তব্য স্থান—তোমার সম্মুখে। অগ্রসর হও, সম্মুখে অগ্রসর হও, মৃত্যু যদি পথে নামিয়া আসে তবে তাহার সহিত পঞ্জা ধরিয়া পথ চল, মহামৃত্যুর পরপারে যে সীমাহীন অমর জীবন, তাহাকেই বরণ করিয়া লও।

অনন্ত শক্তিমান আত্মার মহাশক্তিতে শক্তিমান তুমি, কঠোর তপঃশক্তি-সম্পন্ন ঋষি-মহর্ষিগণের মহানাদর্শে তোমার জীবন গঠিত অনুপ্রাণিত, তাঁহাদের দুশ্চর সাধনার অমোঘ শক্তি তোমার ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত (বিধাতা যে অব্যর্থ বজ্রের অজস্র শক্তি তোমার ভিতরে ভরিয়া দিয়াছেন)। তোমার আবার ভয়, পরাজয়! তোমার আবার ক্লৈব্য, দৌর্ব্বল্য! অসম্ভব, অসম্ভব। জয়, নিশ্চয় জয়। দুর্জ্জয় সাহসে ভর করিয়া, গভীর আত্মবিশ্বাসে বুক বাঁধিয়া জীবন-পথে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হও। দেখিবে—কালবৈশাখীর রুদ্র নিঃশ্বাসে অপসৃত তৃণরাজির মত তোমার উদ্দাম গতিপ্রবাহে সমস্ত বাধাবিঘ্ন কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, অন্তরের সমস্ত ভয়-ভাবনা, সংশয়-সঙ্কোচ, সন্দেহ কোন্ অজ্ঞাত মুহূর্তে কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, পথ সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক, নিরুপদ্রব,—বিজয়লক্ষ্মী সিদ্ধির বরমাল্য হস্তে তোমার প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া ব্যাকুলভাবে দণ্ডায়মানা।

——ঃঃ——

আত্মসম্বিৎ

আত্মন্! স্রোতে প্রবহমান তৃণগুচ্ছের মত জগতের গড্ডালিকা-প্রবাহে ভাসিয়া চলিও না, ঘটনা-বৈচিত্র্যের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া কখনও আত্মসম্বিৎ হারাইও না। দৈনন্দিন কর্মব্যস্ত কলকোলাহলময় জীবনের অন্তরালে নীরব নিভৃতে প্রতিদিন অন্ততঃ একবার করিয়া তোমার মহোচ্চ আদর্শের ধ্যান করিও, চরম লক্ষ্যের বিষয় চিন্তা করিও। প্রতিদিন অন্ততঃ একবার গভীর অভিনিবেশ সহকারে ভাবিয়া দেখিও কিভাবে তুমি তোমার জীবন পরিচালন করিতেছ; যে ভাবে জীবন পরিচালিত হইতেছে, তাহা (তোমার) লক্ষ্যে পৌঁছিবার পক্ষে যথেষ্ট কিনা; যে ভাবে তুমি তোমার সাধন-ভজন-ব্রত-তপশ্চারণ উদ্‌যাপন করিতেছ, তাহা আদর্শ লাভের পক্ষে পর্য্যাপ্ত কিনা? পথিক যেমন প্রতি পদক্ষেপে ধীরে ধীরে তাহার গন্তব্য স্থানের দিকে আগাইয়া চলে, তুমি কি তোমার দৈনন্দিন ধ্যান-ধারণা কাজকর্ম্ম, অনুষ্ঠান-আচরণের ভিতর দিয়া তেমনি ভাবে লক্ষ্যের দিকে আগাইয়া চলিতেছ? তোমার অন্তর কি ক্রমশঃ শান্ত শুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে? মনঃপ্রাণ কি নিত্য নূতন ভাবে, নিত্য নূতন অনুভূতির রাজ্যে বিচরণ করিতেছে? তুমি কি জীবনের পথে নিত্য নূতন আলোকের সন্ধান পাইতেছ? যদি তাহা না পাইয়া থাক, তবে গভীর নিশীথে সমগ্র জগৎ যখন সুপ্তির ঘোরে নিমজ্জিত থাকে, তখন তুমি একবার ধীর পদক্ষেপে অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া শান্তভাবে আত্মানুসন্ধানে রত হও, তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বাহির কর স্বভাবের সমস্ত দোষ-ত্রুটি-গলদ, আর প্রবল

পৌরুষ সহায়ে সে-সমস্তকে সমূলে উৎপাটিত, দূরীভূত করিয়া বীর-বিক্রমে জীবনের পথে বিজয়াভিযান কর।

আত্মন্! গতানুগতিকতার মোহ-গর্ত্তে ডুবিয়া মৃত্যুকে বরণ করিও না। বিভ্রম বিভ্রান্তির কুহকে ভুলিয়া লক্ষ্য ও আদর্শ হারাইও না। জাগতিক ঘটনা-প্রবাহে গা ভাসাইয়া নিশ্চেষ্টভাবে কাল কাটাইলে কিরূপে তুমি তোমার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইবে? বৈষয়িক উন্মাদনা ও সাধারণ কর্ম্ম-প্রাবল্যে উন্মত্ত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলে কি-ভাবে জীবনের শ্রেয়কে লাভ করিবে? জীবনপথ তো সরল, সহজ, মসৃণ নয়; তাহা যে ক্ষুরধারের ন্যায় শাণিত, দুর্গম; একটু অসাবধান হইলেই পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যু সেখানে অবধারিত।

আত্মন্! তুমি তোমার জীবনের মহান্ দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হও, আত্মবোধ ও আত্মস্মৃতিকে জাগাইয়া তোল, পরম শ্রেয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া জীবনের গতিবেগকে বর্দ্ধিত কর, 'ঢিমা তেতালা' ভাব একেবারে বিসর্জ্জন দাও, জ্বলন্ত উল্কার মত প্রচণ্ড তেজে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হও, আর সর্ব্বদা স্বর্ণাক্ষরে হৃদয়পটে শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতার মহাবাণী অঙ্কিত করিয়া রাখ—"আত্মবিস্মৃতিই মহামৃত্যু; আত্মবোধ আত্মস্মৃতিই প্রকৃত জীবন।"

——ঃঃ——

ক্ষণিকের প্রতারণা

ক্ষণিকের ভুল—মানুষের জীবনে এক মহাবিপর্য্যয় ঘটায় ; ক্ষণিকের দুর্ব্বলতা - মানুষের অমল-ধবল চরিত্রে দুরপনেয় কলুষ-কালিমা লেপিয়া দিয়া চির কলঙ্কিত করে ; ক্ষণিকের আত্মবিস্মৃতি—মানুষকে আত্মমর্য্যাদা ভুলাইয়া গৌরবের তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে অধঃপতনের সুনিম্ন সোপানে ঠেলিয়া দেয় ; ক্ষণিকের মোহ—মানুষের মনে গভীর ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া আত্মস্মৃতি ও আত্মকর্ত্তব্য ভুলাইয়া বিপথে টানিয়া নিয়া যায় ; প্রলোভনের নিকট ক্ষণিকের আত্মসমর্পণ - আদর্শনিষ্ঠা ও দৃঢ়তা ভাঙ্গিয়া মানবচরিত্রে পাপ প্রবেশের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়।

অতএব সাবধান। ক্ষণিককে কখনও বিশ্বাস করিও না, ক্ষণিকের প্রতারণায় ভুলিয়া কখনও নিজের বিপদকে ডাকিয়া আনিও না। মনে রাখিও 'ক্ষণিক' ক্ষণিকের জন্য হইলেও মানব-চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব ক্ষণিক নয়—চিরস্থায়ী, অমোঘ। ক্ষণিকের ভুল বুঝিয়া ক্ষণিকের শক্তি ও প্রভাব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া একবার যদি তাহার নিকট আত্মসমর্পণ কর, তবে সেই আত্মসমর্পণের ছিদ্রপথে তোমার ভিতরে যে আত্মঘাতী দৌর্ব্বল্য প্রবেশ করিবে, তাহাকে নিরসন করা তোমার পক্ষে বিষম কষ্টকর, এমন কি এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িবে ; কারণ ক্ষণিকের কুহকী মায়া ও প্রলোভনের শক্তি বড় সাংঘাতিক। জীবন-পথে পাপ প্রলোভন যখন মানুষকে অতি মাত্রায় প্রলুব্ধ করিয়া তোলে তখন এই ক্ষণিকের সান্ত্বনা ও আশ্বাসেই মানুষ বিবেকের সহিত রফা করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে অগ্রসর হয়। মানুষ

তখন তাহার বিবেক, তাহার বিচারবুদ্ধিকে এইভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করে যে—আচ্ছা, এইবার ক্ষণিকের জন্য এই দুর্ব্বলতাকে আশ্রয় দেই, বরং ভবিষ্যতে আর কখনো না দিলেই চলিবে ; আচ্ছা, এই বারের জন্য এই অন্যায়টি করি, আর কখনো না হয় ইহা না করিব ; আচ্ছা, এই মুহূর্ত্তের জন্য প্রলোভনের এই আবদারটুকু বরং বন্ধুত্বের উপরোধে স্বীকার করিয়া লই, তাহাতে আর কি হইবে, আর কোন সময় ইহা না করিলেই হইবে। এমনি ভাবে বার বার প্রতিবারই সে ক্ষণিকের দোহাই দিয়া দুর্ব্বলতার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া ক্রমশঃ চরিত্রের দৃঢ়তা ও আদর্শনিষ্ঠা হারাইয়া হীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অবশেষে মানুষ এমন এক সংকটময় অবস্থায় উপনীত হয়, যখন পাপের প্রতি ঘৃণা ও অন্যায়বোধ চলিয়া যায়, সঙ্কল্প ও সংগ্রাম-শক্তি লোপ পায়, সংযমের বাঁধ নষ্ট হইয়া জীবনের মেরুদণ্ড একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। তখন ক্ষণিক আর 'ক্ষণিক' নয়, 'ক্ষণিক'ই চিরন্তনে পরিণত হইয়া মানুষকে মহামৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করে।

সংগ্রামই জীবনের পরিচায়ক, সংগ্রামের ভিতর দিয়াই মানুষ প্রকৃত শক্তি আহরণ করে, সংগ্রামের বলেই মানুষ জগতের বুকে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া সসম্মানে বাঁচিয়া থাকে। সুতরাং ক্ষণিকের প্রতারণায় আত্মবিস্মৃত হইয়া কখনও জীবন-সংগ্রাম পরিত্যাগ করিও না। অন্যায় যাহা, পাপ যাহা, ক্ষণিকের জন্য হইলেও তাহা অন্যায় ও পাপ। তাহার সহিত কখনও আপোষরফা চলে না। বিন্দু বিন্দু বারিসমষ্টি যেমন মহা-পারাবার সৃষ্টি করে, তেমনি ক্ষণিকের সমষ্টিই দিন-মাস-বৎসর তৈয়ারী করে। তাই জীবন-পথের বীর অভিযাত্রী যে, সে চিরকালই অন্যায় ও দুর্ব্বলতার সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়া জীবনের কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথে

অগ্রসর হয়। প্রাথমিক প্রচেষ্টা হয়তো ব্যর্থ হইতে পারে, কিন্তু প্রতি-বারের প্রতিরোধশক্তি পরবর্ত্তী বারের সংগ্রাম-প্রচেষ্টার সহিত যুক্ত হইয়া মানুষকে ক্রমশঃই অধিকতর শক্তিসম্পন্ন করিয়া তোলে। অবশেষে মানুষ এমন এক দুর্জ্জয় শক্তি লাভ করে যাহার বলে জগতের সমস্ত বিরুদ্ধভাব ও শক্তিকে চুর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া সে স্ব-ভাবে স্ব-মহিমায়, স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হয়। তখন বিধাতা স্বয়ংই আসিয়া তাহার ললাটে সাফল্যের বিজয়তিলক পরাইয়া দেন।

আত্মন্! জীবন-সাধনায় যদি কৃতি হইতে চাও, তবে সর্ব্বদা বিচারের কোষমুক্ত তরবারি উদ্যত রাখ। যে কোন মুহূর্ত্তে যে কোন শত্রু যে কোন বেশে উপস্থিত হউক না কেন, অমনি তাহার উপর আঘাত করিবে। শত্রু যেন কোন মুহূর্ত্তে তোমাকে অসতর্ক না দেখে, অসাবধান অপ্রস্তুত অবস্থায় না পায়। তুমি যদি অন্যায়ের সহিত, পাপের সহিত, আপোষ না করিয়া সর্ব্বদা সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত থাক তবে স্বয়ং ভগবানই তোমাকে রক্ষা করিবেন। ভগবান শুধু বাহিরের কাজ দেখেন না, তিনি দেখেন মানুষের অন্তর, মনোবৃত্তি। সংগ্রাম করিয়া পরাভূত হইলে, ঘটনাচক্রে পড়িয়া বাধ্য হইয়া স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনও কোনও অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিলে তাহা তত দোষের হয় না; সেই অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন। কিন্তু স্বেচ্ছায় কেহ কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দিলে, পাপের সহিত রফা করিয়া স্বেচ্ছায় তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলে, দুর্ব্বলতার সহিত সংগ্রাম না করিয়া সাদরে তাহাকে বরণ করিয়া লইলে নিতান্ত আপনার জনও তাহাকে ক্ষমা করে না। সুতরাং ক্ষণিকের মোহজাল ছিন্ন করিয়া বীর বিক্রমে জীবনের পথে জয়যাত্রা সুরু কর। শত্রু যদি মিত্রবেশে আপোষরফার

প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হয়, শান্তির বাণী লইয়া সন্ধি করিতেও আসে, তবুও তাহাকে ক্ষমা করিবে না। জীবন-সংগ্রামে আপোষ-রফা, সন্ধি বা শান্তি প্রস্তাবের কোন স্থান নাই, সেখানে হয় বিজয়—সিদ্ধি, না হয়—মৃত্যু—এই এক কথা। ওঁ শম্।

আঘাত

(অপরের প্রতি)

কখনও কাহাকেও অযথা আঘাত করিও না; তোমার কোন প্রকার ব্যবহার, আচরণ, বাক্য, কার্য্য, ভাব বা অন্য কিছুর দ্বারা কখনও কাহারও মনে নিরর্থক ব্যথা দিও না।

দুই দিনের জন্য এখানে আসিয়াছ, ক্ষণিকের জন্য দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য উপলক্ষ্য করিয়া সকলে মিলিত হইয়াছ, জগদ্রঙ্গমঞ্চে আপনার অভিনয় শেষ করিয়া দুই দিন পরে আবার কোথায় চলিয়া যাইবে। তাই যতটুকু পার অপরকে শান্তি দাও, আনন্দ দাও। গোলাপ যেমন কণ্টকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও সকলকে সুগন্ধ দান করে, তুমিও তেমনি জগতের নিকট হইতে যতই আঘাত ও দুর্ব্ব্যবহার পাও না কেন, প্রতিদানে প্রতিঘাত না করিয়া শুধু শান্তি ও সান্ত্বনাই পরিবেশন কর।

মানুষ যে জিনিষটি নিজে ভালবাসে সেটিই সে অপরকে দান করিয়া আনন্দ পায়। কিন্তু তুমিতো কাহারও নিকট হইতে আঘাত বা দুর্ব্ব্যবহার পাইতে ভালবাস না, তবে অপরকেই বা তুমি তাহা দিবে

কেন ? মনে রাখিও, তুমি যেমন অন্যের নিকট হইতে অযথা কোন আঘাত পাইতে চাও না, অন্যেও তেমনি তোমার নিকট হইতে অযথা কোন আঘাত পাইতে চায় না। তুমি যেমন অন্যের অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হও, অন্যেও তেমনি তোমার অপ্রীতিকর ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয়। শুধু তাই নয়, তোমার অপ্রীতিকর ব্যবহাররূপ আঘাতই অপরের নিকট হইতে প্রতিঘাতরূপে আসিয়া আবার তোমাকেই ব্যথায় জর্জ্জরিত করিয়া তুলিবে। সুতরাং তুমি যদি (নিজে) কাহারও নিকট হইতে আঘাত পাইতে না চাও, তবে তুমিও কাহাকেও আঘাত করিবে না ; তুমি নিজে কাহাকেও আঘাত করিলে তাহা আজই হউক বা কালই হউক প্রতিঘাতরূপে আবার তোমারই নিকট ফিরিয়া আসিবে। কেননা, মানুষ যেমন চিন্তা ভাবনা ও আচরণ করে তাহারই একটা প্রতিক্রিয়া বাহিরে পারিপার্শ্বিক অপর সকলের ভিতর সংঘটিত হয় এবং সে যখন যেখানে যায়, তখন তাহার নিজের ভাবের প্রতিচ্ছবি সেখানে প্রতিফলিত দেখিতে পায়। প্রত্যেক মানুষের নিজের ভাব, প্রকৃতি ও আচরণ দ্বারা তদনুকূল একটা পরিবেশ আপনিই সৃষ্টি হয় এবং যে কোন ব্যক্তিই তাহার সংস্পর্শে আসুক না কেন, সেইভাবে সে অল্পবিস্তর অনুপ্রাণিত হইবেই।

জীবন-সাধনার সাধক ! তুমি সর্ব্বপ্রকার বৈরভাব* ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ উপদ্রবশূন্য ও মহৎ হও। অন্তরে বাহিরে সকলের প্রতি প্রেম

---

*ইহা কর্ম্মযোগী সাধকের সাধন-জীবনের একটি অধ্যায় বিশেষ। ইহার দ্বারা কখনও অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার না করা, বা কাহারও দোষ-ত্রুটি-অপরাধ সংশোধনের জন্য শাসন না করা বুঝায় না। কেননা, এই শাসন ও প্রতিকার চেষ্টা সাময়িক ভাবে দুঃখ বা অশান্তির কারণ হইলেও ইহাতে

ও সহানুভূতিপূর্ণ এক পরম শান্তিময় আবহাওয়ার সৃষ্টি কর। তোমার নিকট হইতে সর্ব্বদা এক মহানন্দময় ভাবপ্রবাহ চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হউক, আর সমগ্র দেশবাসী তাহাতে অবগাহন করিয়া শুদ্ধ, শান্ত ও আনন্দময় হইয়া উঠুক। কেন না, এজগতে প্রকৃত মহৎ যে, কুঠারাহত চন্দন বৃক্ষ হইতে সুগন্ধ বিস্তারের আঘাত-আক্রমণে তাঁহার ভিতর হইতে কেবল মহত্ত্বই বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। ।। ওঁ শম্ ।।

পরিণামে মানুষ নির্দ্দোষ হইয়া প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। কারণ, ইহার মূলে দোষত্রুটি অন্যায়ের সংশোধন পূর্ব্বক প্রকৃত মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার প্রেম ও সহানুভূতিপূর্ণ মহান্ উদ্দেশ্য রহিয়াছে। যে আঘাত-আক্রমণের ভিতর এই মহান্ উদ্দেশ্যের পরিবর্ত্তে শুধু অপদস্থ করা বা শাস্তি দেওয়ার আক্রোশমূলক শত্রুভাব থাকে. তাহারই সম্বন্ধে এই কথা এখানে বলা হইয়াছে।

কর্ম্মী'র জীবন-মন্ত্র

ক্ষমতাপ্রিয়তা ও প্রভুত্বলিপ্সাই কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মীর প্রধান বিপদ। গভীর সমুদ্রে বিচরণকারী অর্ণবপোত যেমন সহসা চোরা-পাহাড়ে আঘাত খাইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তেমনি সংসারক্ষেত্রে পর্য্যটনকারী উদ্দাম কর্ম্ম-প্রবণ ব্যক্তির জীবনও অতর্কিতে ক্ষমতাপ্রিয়তা ও প্রভুত্বলিপ্সার মোহে পড়িয়া বিনষ্ট হয়। মানুষ যখন কর্ম্মের প্রবল উন্মাদনায় আত্ম-স্মৃতি হারাইয়া ফেলে, যখন সে ভুলিয়া যায় যে, কর্ম্মটাই মানুষের আসল উদ্দেশ্য নয়, কর্ম্মের ভিতর দিয়া মানুষ 'হওয়াটা'ই প্রকৃত উদ্দেশ্য, কর্ম্ম

শুধু বাহিরের অবলম্বন, ইহার ভিতর দিয়া নিজের ও অপরের জীবনকে গড়িয়া তোলাই প্রকৃত লক্ষ্য—তখনই তাহার ভিতর দেখা দেয় যশ-মান-প্রতিষ্ঠার উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা, প্রভুত্ব ও ক্ষমতা লাভের আত্মবিধ্বংসী দুর্ব্বার স্পৃহা।

অহঙ্কার ও দাম্ভিকতাই মানুষকে দায়িত্বহীন, দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, কর্ত্তৃত্বাভিমানই প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মীর কর্ম্মশক্তি ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি নষ্ট করিয়া তাহাকে স্বার্থান্ধ ও অকর্ম্মণ্য করিয়া দেয়। মানুষের ভিতর যখন উৎকট ক্ষমতালোলুপতা ও উদগ্র কর্ত্তৃত্বস্পৃহা দেখা দেয়, তখন তাহার সাধারণ বিচারবুদ্ধি ও হিতাহিত বিবেচনাশক্তি পর্য্যন্ত লোপ পায়; সে তাহার অসম্বন্ধ বাক্যালাপ ও নির্লজ্জ আচরণের দ্বারা পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া, এমন কি অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ ও সহকর্ম্মীদের মনোবৃত্তি পর্য্যন্ত বিষাক্ত, বিরক্তিপূর্ণ করিয়া তোলে। মানুষ অত্যুগ্র নাম ও যশোলোলুপতার ফলে এমন আত্মবিস্মৃত ও বিচার-বিমূঢ় হইয়া পড়ে যে, তাহার অসঙ্গত অসম্পৃক্ত আলাপ ব্যবহারের দ্বারা সে যে সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হইতেছে, তাহাও সে বুঝিতে পারে না।

শিশু বা উন্মাদের মত নিরর্থক হস্তপদ সঞ্চালন, অথবা বাত্যা-তাড়িত তৃণখণ্ডের মত কামনা-বাসনা-রিপু-ইন্দ্রিয়-তাড়িত মানুষের দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞান-শূন্যাবস্থায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটিই কর্ম্ম নয়; ভগবদ্ভাবে উদ্বুদ্ধ আত্মাভিমানশূন্য মানুষের জনকল্যাণে প্রযুক্ত প্রচেষ্টাই প্রকৃতপক্ষে কর্ম্ম। উপযুক্ত ধন্বন্তরী যেমন বিষকে শোধন করিয়া লইয়া মৃতসঞ্জীবনী-সুধায় পরিণত করে, তেমনি প্রকৃত কর্ম্মীও ভগবৎ-শরণাগতির দ্বারা কর্ম্মকে শোধন করিয়া লইয়া যোগে পরিণত করে ("যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম")। আত্মসমর্পণ, আত্মনিবেদনের ভিতর দিয়া কর্ম্মী কর্ম্মের

কর্তৃত্বাভিমানরূপ বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া কর্ম্মকে নির্ব্বিষ, নির্দোষ করিয়া লয়। কর্ম্ম তখন দম্ভাভিমানের আকর, প্রবৃত্তিমূলক ও বন্ধনের কারণ হয় না, কর্ম্ম হয় তখন মুক্তির কারণ—নিষ্কাম, যোগ, ভগবানের সহিত মিলিত হইবার অবলম্বন স্বরূপ। কর্ম্মের ভিতর দিয়া কর্ম্মী তখন ভগবানের সহিত যুক্ত হয়।

ভগবানই মানুষের সমস্ত শক্তির একমাত্র উৎস। নদী যেমন আত্ম-বিসর্জ্জনের দ্বারা বিশাল বারিধিবক্ষ হইতে বিপুল বারিরাশি সংগ্রহ করিয়া লইয়া জনকল্যাণের জন্য সমগ্র দিগ্দেশে তাহা ঢালিয়া দেয়, প্রকৃত কর্ম্মীও তেমনি আত্মোৎসর্গের দ্বারা ভগবানের নিকট হইতে শক্তি আহরণ করিয়া নিয়া জগন্মঙ্গলের নিমিত্ত কর্ম্মরূপে উহা উৎসারিত করিয়া দেয়। সেখানে কোন অহঙ্কার, অভিমান, দম্ভ থাকে না, থাকে না কোন কর্তৃত্ব, প্রভুত্বস্পৃহা ও ক্ষমতা-মত্ততা; সেখানে থাকে শুধু আত্মনিবেদন, আত্মোৎসর্গ, আত্মবিসর্জ্জন, জনকল্যাণ ও জীবসেবা।

উৎসমুখে বালি সঞ্চিত হইলে নদী যেমন সমুদ্রের সহিত সংযোগশূন্য হইয়া ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যায়, কর্ম্মীর ভিতরেও তেমনি আত্মবিসর্জ্জন ও নিঃস্বার্থপরতার পরিবর্ত্তে অহঙ্কার অভিমান, ভোগসুখাকাঙ্ক্ষা, মান-যশ-প্রতিষ্ঠার বাসনা দেখা দিলেই সে অনন্ত শক্তির আধার ভগবানের সহিত যোগসূত্র হারাইয়া শক্তিহীন হইয়া পড়ে। সমুদ্রের সহিত সংযোগহীন স্রোতঃশূন্য নদীর জল যেমন বিকৃত ও রোগবীজাণুপূর্ণ হইয়া সকলের অপেয় ও প্রাণহননের কারণ হয়, তেমনি ভগবানের সহিত যোগশূন্য, দম্ভাহঙ্কারপূর্ণ, কর্তৃত্বাভিমানী কর্ম্মীর আসুরিক কর্ম্মও জীবজগতের শান্তি ও কল্যাণ বিধান না করিয়া অশান্তির আগুনই জ্বালাইয়া দেয়।

নদীর গতিবেগ অব্যাহত রাখিতে হইলে যেমন সমুদ্রের সহিত সংযোগ-পথ পরিষ্কার রাখা দরকার, তেমনি কর্ম্মীর জগন্মঙ্গল কর্ম্মপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলেও ভগবৎপ্রেরণা ও ভগবৎ-শক্তি আহরণের-পথ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। বালি যেমন চড়া সৃষ্টি করিয়া সমুদ্র সঙ্গমের পথ বন্ধ করিয়া দেয়, তেমনি দম্ভাভিমান প্রভৃতিই কর্ম্মীর ভগবচ্ছক্তি ও প্রেরণা লাভের পথ রুদ্ধ করে। সুতরাং কর্ম্মীকে প্রতিনিয়ত আত্মানুসন্ধানের আলোক-বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া অতি সাবধানে পথ দেখিয়া সন্তর্পণের সহিত কর্ম্মের দুর্গম পথে পদক্ষেপ করিতে হয়। তাহা না হইলে যে কোন মুহূর্ত্তে অহঙ্কার অভিমানরূপ চোরাবালিতে আবদ্ধ হইয়া জীবন-তরণী বেসামাল হইতে পারে।

---*---

জাগতিক নিন্দা ও গালি

আত্মন্! শান্ত, শুদ্ধ, প্রবুদ্ধ হও। মানুষের নিন্দা ও গ্লানিতে কর্ণপাত করিও না; লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অসম্মান, অপমানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিও না; অনাদর অশ্রদ্ধা, তিরস্কার, উপেক্ষায় হতাশ ও মুহ্যমান হইও না। স্বার্থসঙ্কীর্ণ, ঈর্ষাপরায়ণ মানবের হৃদয়োদ্গীরিত এই তীব্র হলাহলকে আকণ্ঠ পান করিয়া তুমি নীলকণ্ঠ হও, জ্ঞানবৃদ্ধ, প্রবৃদ্ধ ভীষ্মের মত অর্ব্বাচীন মানব-নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ শররাজিদ্বারা শরশয্যা রচনা করিয়া সুখে নির্ব্বিকারচিত্তে তুমি তাহাতে বিশ্রাম কর। এ জগতে (কাজ করিতে গেলে) "কেহ বা তোমারে মালা পরাইবে, কেহ বা তোমারে পদ প্রহারিবে।" কিন্তু তুমি তাহাতে বিচলিত হইয়া জীবন-সাধনায়

নিশ্চেষ্ট থাকিও না, নিরর্থক চিত্তের প্রশান্তি ভাঙ্গিয়া অশান্তিকে ডাকিয়া আনিও না। জগতের পুঞ্জীভূত পাপতাপ, স্তূপীকৃত জঞ্জালজালে অগ্নি-সংযোগ করিতে যাহারা বদ্ধপরিকর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানবের তিক্ত রসনা তাঁহাদেরই নিন্দায় মুখর হইয়া উঠে। যাঁহারা গতানুগতিক পূতিপর্য্যু-ষিত বদ্ধ ভাবধারার পরিবর্ত্তে জীবন্ত ও নূতন প্রেরণাময় উচ্ছল জীবন-প্রবাহ নিয়া উদ্দাম বেগে ছুটিয়া চলে, জগতের সবল হস্ত তাঁহাদেরই জীবন-পথে সর্ব্বদা বিপদের পাহাড় রচনা করে। শুধু তাই নয়, তাঁহা-দরই মর্ম্মস্থলে নির্ম্মম আঘাত হানিবার জন্য সবলে উদ্যত হয়, জগতের বুক হইতে তাঁহাদিগকে মুছিয়া ফেলিবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে।

একদিন যাহারা তোমার অন্তরঙ্গ সুহৃদ, প্রিয়তম বন্ধু ও নিকটতম আত্মীয় ছিল, তাহারাই পরে হইবে তোমার পরম শত্রু। একদিন যাহারা তোমার নিত্য সাথী, সহায়ক ছিল, সমস্ত সময় ছায়ার মত প্রতি পদবিক্ষেপে তোমার অনুসরণ করিত, তাহারাই হইবে তোমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, পরম বিরুদ্ধাচারী ; যাহাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করিবার জন্য তুমি তোমার সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিতে, নিজেকে সহস্র বিপদে ফেলিয়াও যাহাদিগকে বিপন্মুক্ত রাখিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতে, তাহারাই আজ তোমাকে বিপদজালে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা-নিরত। ইহাই জগতের নিয়ম। যতক্ষণ তুমি নিজেকে সকলের সহিত সমপর্য্যায়ে রাখিয়া মিলিয়া মিশিয়া ঘটনা-প্রবাহে গা ভাসাইয়া গতানুগতিক পথে চলিবে, ততক্ষণ সকলেই মিত্রের মত তোমার সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিবে ও একই সূত্রে গ্রথিত থাকিবে। কিন্তু যখনই তুমি তোমার বিশিষ্ট ভাব, রূপ, আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতি নিয়া জীবন-পথে জয়যাত্রা সুরু

করিবে, যখনই তুমি তোমার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাধন-গরিমায় মহিমান্বিত হইয়া অপর সকল হইতে স্বতন্ত্র প্রতিভায় প্রতিভাত হইতে থাকিবে তখনই অপর সকলে হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইয়া তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে দণ্ডায়মান হইবে।

আত্মন্! জাগতিক ঘটনা-পরম্পরার উর্দ্ধে, নিন্দা-স্তুতি প্রভৃতি ব্যবহারিক জীবনের পরপারে সেই দ্বন্দ্বাতীত শান্ত ভূমিতে তুমি অবস্থান কর। তোমার অন্তরের বাহিরে, চতুষ্পার্শ্বে স্বীয় আদর্শানুযায়ী একটি শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হও, আত্মভাবে সমাহিত থাকিয়া ব্যবহারিক জগতের দ্বন্দ্ব-কোলাহল, আবিলতা-পঙ্কিলতা, ঘাত-প্রতিঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চল। দুনিয়ায় যে মানুষ হইতে চায়, জগৎকে কিছু নূতন জিনিষ দিতে চায়, তাহাকে কাহারও মতামতের দিকে ফিরিয়া তাকাইলে চলে না। স্বীয় মহান্ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বর্ষার বৃষ্টিধারার মত জগতের নিন্দা গালিকে তাহার মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া লইতে হয়।

মানুষ সমালোচনায় ক্ষুণ্ণ হয় তখনই, যখন তাহার ভিতর মান-যশ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা উদগ্র হইয়া উঠে। মানুষ যখনই প্রশংসা-সুখ্যাতি লাভ করিবার জন্য লালায়িত হয়, আদর-যত্ন-ভালবাসা-সহানুভূতি ও সমবেদনার কাঙ্গাল হইয়া জগতের দ্বারে ভিক্ষাপাত্র লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে শুরু করে, তখনই সে কেবল অন্যের মতামতের দিকে ফিরিয়া তাকায়, তখন কে কি বলিল না বলিল, কোন্ সময়, কোন কাজে কে কি ভাবিল না ভাবিল তাহা ভাবিয়া বিচলিত হয় এবং ধীরে ধীরে আপন স্বাধীন চিন্তা, ভাব, আদর্শ, ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দিয়া পরমতের দাস হইয়া পড়ে। তখন আপনার মহত্ত্ব

ঔদার্য্য প্রভৃতি যথাসর্ব্বস্ব বলি দিয়া শুধু অপরের মন রক্ষা করাই তাহার কাজ হইয়া দাঁড়ায়।

জীবন-লক্ষ্যের সন্ধানী সাধক! তুমি যশ, মান, প্রতিষ্ঠাকে পদদলিত করিয়া দৃপ্ত সিংহের মত সমুন্নত শিরে জীবন-পথে অগ্রসর হও; আদর, যত্ন, ভালবাসা ও সুখ্যাতি-লাভের মানসিক দুর্ব্বলতাকে পরিহার করিয়া সমস্ত নিন্দা ও বিরুদ্ধ-সমালোচনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন কর। প্রদীপের সলিতার মত প্রতিনিয়ত আদর্শের জন্য অকুণ্ঠিত চিত্তে তিলে তিলে আত্মদান করিতে প্রস্তুত হও, দেখিবে —জগতের ভ্রূভঙ্গী কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে।

নিন্দুকের নিন্দা, বিরুদ্ধবাদীর সমালোচনায় যতই উদাসীন হওয়া যায়, যতই তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা যায়, ততই তাহার শক্তি ও প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়। প্রতি মুহূর্ত্তে যাহাকে ফিরিয়া ফিরিয়া অপরের দিকে তাকাইতে হয়, তাহার দ্বারা কোন বড় কাজ হওয়ার আশা সুদূর-পরাহত। জগতের নিন্দা-স্তুতিকে অগ্রাহ্য করিয়া চলার মত সামর্থ্য যাহার আছে, তাহার বিপুল পরাক্রম, প্রবল গতিবেগকে প্রতিহত করিতে পারে এমন ঐরাবত এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আজও সৃষ্ট হয় নাই।

——:*:——

প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান

ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রকৃত সার্থকতা ভগবদনুভূতিতে। জীবন ভরিয়া কত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, নিয়ম-নিষ্ঠায় থাকিলে, জপ, উপবাস, স্নান, দান করিলে, কত না শাস্ত্রাধ্যয়ন, তীর্থভ্রমণ, দেবদর্শন, সাধুসঙ্গ হইল, কিন্তু তাহা দ্বারা অনুভূতির রাজ্যে কতদূর অগ্রসর হইলে? এত সব ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া অন্তরের মালিন্য কতটুকু দূরীভূত হইল? পাপের প্রতি ঘৃণা, অন্যায়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধা, সত্য-সংযম, পবিত্রতা ও ত্যাগের প্রতি নিষ্ঠা ও অনুরাগ কতখানি বৃদ্ধি পাইল? দিনের পর দিন শুধু নানাপ্রকার অনুষ্ঠান করিয়া যাওয়াই তো জীবনের লক্ষ্য নয়, অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া কামনা-বাসনার ত্যাগ, চিত্তশুদ্ধি ও ভগবদনুভূতিই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও কাম্য। দৈনন্দিন জীবন-সাধনার ভিতর দিয়া সেই দিকে কতদূর অগ্রসর হইতেছ তাহা প্রতিদিন বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিতেছ কি?

ভগবদনুভূতিই ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রকৃত মাপকাঠি। বিদ্যুৎ খরচের পরিমাণ যেমন বিদ্যুৎ পরিমাপক যন্ত্রে (মিটারে) ধরা পড়ে, তেমনি ধর্ম্মকাজ ও অনুষ্ঠানসমূহ ও ঠিক ঠিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইল কিনা, তাহা ভগবদনুভূতিতে ধরা পড়ে। তাই খাঁটি সাধক যে, সে এই অনুভূতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া দৈনন্দিন সমস্ত কাজকর্ম্ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠানসমূহ করিয়া যায়, প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান সে ভগবদনুভূতির মাপকাঠিতে মাপিয়া পরীক্ষা করিয়া লয়। ধর্ম্মানুষ্ঠানসমূহ তাঁহার নিকট শুধু অভ্যাসজনিত নীরস, প্রাণহীন, উদ্দেশ্যশূন্য কাজমাত্র নয়, উহা সেখানে মহান্

ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ, জীবনের পরম লক্ষ্য-সাধনার তীব্র ব্যাকুলতায় জীবন্ত।

অনুষ্ঠানের প্রাণ অনুভূতিতে। অনুষ্ঠানসমূহ প্রাণবন্ত হইয়া উঠে সাধকের মহান্ অনুভূতির দিব্য স্পর্শ ও প্রেরণায়। সাধক যখন অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে অনুভূতির রাজ্যে প্রবেশ করিতে থাকে, দৈনন্দিন ধর্ম্মসাধনার ভিতর দিয়া সমস্ত প্রাণমন যখন নিত্যনূতন ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত হয়, মালিন্যের পর মালিন্য ঘুচিয়া, আবরণের পর আবরণ উন্মোচিত হইয়া সাধক যখন ক্রমশঃ লক্ষ্যের সমীপবর্ত্তী হইতে থাকে, তখন তাঁহার সাধনার সেই বিপুল আনন্দধারা, সেই গম্ভীর ভাবাবেগ বর্ষাকালীন নদীসমূহের উচ্ছ্বসিত বারিপ্রবাহের মত অন্তর ছাপাইয়া সমস্ত দিগ্দেশ প্লাবিত করিয়া চলে। সে তখন মহাভাবে মাতিয়া জগৎকে মাতাইয়া লয়, সিদ্ধির মহানন্দে সকলকে আনন্দিত করিয়া তোলে। তখন তাঁহার প্রতি কাজ, প্রত্যেক অনুষ্ঠান প্রতি বাক্য, এমন কি প্রত্যেকটি হাবভাব, নড়ন-চড়ন, দৃষ্টিভঙ্গী পর্য্যন্ত অপরের ভিতর এক মহাভাবের আলোড়ন সৃষ্টি করে; যে তাঁহার সংস্পর্শে আসে, সে-ই এক অভিনব আনন্দে মাতিয়া ওঠে, একটা অভূতপূর্ব্ব নূতন প্রেরণা লইয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। অনুষ্ঠানসমূহ তখন আর শুধু প্রাণহীন অঙ্গভঙ্গী বা হস্তপদের কসরৎ নয়, উহা তখন মহান্ ভাবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, অপূর্ব্ব তেজোদীপ্ত, ভাবোচ্ছল ও ঐশ্বরিক শক্তিতে সমুজ্জ্বল।

আলো ও অন্ধকার যেমন এক সঙ্গে থাকতে পারে না, তেমনি মালিন্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠান, পাপাশক্তি ও ধর্ম্মানুরাগ একত্র অবস্থান করিতে পারে না। সমস্ত জীবন ভরিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, অথচ তাহাতে

অন্তরের কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইল না ; যেমনি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছ, তেমনি সময় সুযোগমত আবার অবলীলাক্রমে পাপকার্য্যও করিয়া যাইতেছ—ইহা কখনও হইতে পারে না। যদি হয়, তবে বুঝিতে হইবে ভাবের ঘরে চুরি হইয়াছে, ধর্ম্মানুষ্ঠান ঠিক ঠিক সম্পাদিত হয় নাই —হইতেছে না। অনুষ্ঠানসমূহ যেখানে অন্তরের সহিত সংযোগশূন্য, ভাবহীন, জীবনের মহান্ লক্ষ্য-সাধনার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হইয়া শুধু অভ্যাসবশে অনুষ্ঠিত হয়, সেখানেই তাহা গতিহীন দুর্ব্বল, তাই নিস্ফল নিরর্থক ; তাহাতে অনুষ্ঠাতার প্রাণেই সাড়া জাগায় না তো অন্যের প্রাণে সাড়া জাগাইবে কি ? নোঙ্গরবদ্ধ নৌকায় দাঁড় টানার মত শুধু পণ্ডশ্রম, জীবন তাহাতে একটুও উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় না।

প্রকৃত জীবন-পথের পথিক ! তুমি সর্ব্বদা খুব সাবধান, সজাগ থাকিও। তাহা না হইলে কে আসিয়া তোমার ভাবের ঘরে কখন চুরি করিয়া যাইবে, কিছুই বুঝিতে পারিবে না। সুতরাং যখনই দেখিবে ব্রতনিয়ম, পূজা প্রার্থনা, সৎকর্ম্ম সদনুষ্ঠান, শাস্ত্রাধ্যয়ন, ধর্ম্মালোচনা প্রভৃতি করিয়াও পাপাসক্তি ও ভোগাকাঙ্খা প্রশমিত হইতেছে না, নিত্য নূতন অনুভূতির আনন্দে প্রাণমন ভরিয়া উঠিতেছে না, তখনই সতর্ক হইবে ; অন্তরের কোথায় কোন্ গোপন অন্তরালে দোষত্রুটিগলদ আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিবে এবং সযত্নে তাহার মূল উৎপাটন করিতে বদ্ধপরিকর হইবে। তাহা না হইলে মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর, এমন কি জীবনভর নানাবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও জীবন-শেষে দেখিবে, তুমি যে তিমিরে ছিলে সেই তিমিরেই আছ, জীবনের একটুও উন্নতি হয় নাই, শুধু সাধুতার মিথ্যা অভিমান ও দাম্ভিকতার বোঝা বাড়িয়া চলিয়াছে।

——:*:——

বিশ্বাস ও অবিশ্বাস

নিজেকে যে নিজেই বিশ্বাস করিতে পারে না, নিজের শক্তি-সামর্থ্য-সততার উপরে অনাস্থা যাহার পদে পদে, এ-জগতে তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারে কে? যদি অন্যের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে চাও, তবে সকলের আগে নিজেকে নিজে বিশ্বার কর, নিজের শক্তি ও সততায় নিজে আস্থা স্থাপন কর, নিজেকে নিজে আগে শ্রদ্ধা করিতে, মর্যাদা দিতে শিখ। আত্মমর্যাদাবোধ যাহার সুদৃঢ়, আত্মশক্তি ও সততায় বিশ্বাস যাহার অচল অটুট, দুনিয়ায় তাহাকে কেহ অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধা করিতে পারে না। সংশয়ী চিত্তের সমস্ত সংশয় সন্দেহ তাহার প্রবল আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদাবোধের নিকট কুণ্ঠায় সঙ্কুচিত হয়, অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস সভয়ে দূরে পলায়ন করে।

মানুষ মানুষকে কখনো অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস করিতে পারে না, যদি না সে নিজে তাহার সুযোগ দেয়। যে কোন কাজে, যে কোন বিষয়েই হউক না কেন, মানুষ নিজের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে ভিতরে অনাস্থা পোষণ করিয়া নিজেই প্রথমে নিজেকে অবিশ্বাস করে, আত্মশক্তি, আত্মস্মৃতি ও আত্মমর্যাদাবোধের অভাবে নিজেকেই সে নিজে আগে অশ্রদ্ধা করিতে ও অমর্যাদা দিতে সুরু করে, তাহার পরে অন্য সকলে তাহাকে ও অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস করে। অন্যের অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা বস্তুতঃ নিজের অন্তরে লুকায়িত মনোভাবেরই প্রতিচ্ছবি। স্বীয় অন্তরের অবিশ্বাস অশ্রদ্ধাই অপরের ভিতর বাস্তব রূপ নিয়া অপরের মারফৎ আমাদের নিকট

উপস্থিত হয়। সুতরাং এ সম্বন্ধে অন্যের উপর দোষারোপ করিবার আগে নিজেরই বিশেষ ভাবে সাবধান হওয়া উচিত।

আত্মশক্তি ও আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে সজাগ হও। কথায় ও কাজে সকলকে তাহার পরিচয় দাও। স্বপ্নে বা কল্পনায়ও যেন কোনও মুহূর্ত্তে তোমার ভিতরে কোন প্রকারে আত্মমর্যাদায় সন্দেহ না জাগে, আত্মশক্তিতে অনাস্থা ও অবিশ্বাস না আসে। হৃদয়পটে স্বর্ণাক্ষরে শ্রীশ্রীযুগাচার্য্যের অভয়মন্ত্র লিখিয়া রাখ—**"আত্মবোধ, আত্মস্মৃতিই প্রকৃত জীবন,"** আর **"আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাজ্ঞানই মানুষের মহাসম্বল।"**

——::——

মতান্তর ও মনান্তর

কর্ম্মক্ষেত্রে মতান্তর খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু দেখিও মতান্তর যেন কখনও মনান্তরে পরিণত না হয়।

কর্ম্মী যখন তাহার কর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া যায়, জীবনের মহান্ লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়ে, স্বাধীন মতবাদ, বিচারবুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের নামে যখন দাম্ভিকতা আসিয়া দেখা দেয়, তখন আত্মবিস্মৃতির সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তেই মতান্তর আসিয়া মনান্তর, ক্রমে মতবিরোধ ও সংঘর্ষে পরিণত হয়। তখন কর্ম্মের সমস্ত উদ্যোগ, আয়োজন পণ্ড হইয়া যায়, কর্ম্মীদের সমস্ত উৎসাহ, উদ্যম ও প্রাণের শান্তি বিনষ্ট হয়; ফলে, সকলের কর্ম্মশক্তি ও প্রচেষ্টার সমবায়ে যে বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারিত, তাহার শেষ আশাটুকু পর্য্যন্ত নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম হয়।

হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার ! জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে সজাগ, সাবধান হও, কর্ম্মের উদ্দেশ্যের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ নেতা যে, তার কর্ম্ম-তরী কখনও মত-বিরোধের মাঝদরিয়ায় বানচাল হয় না। তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্ব্বদা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি উদ্যত থাকে। তাই সে সুকৌশলে বিভিন্ন কর্ম্মীর বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক সম্ভাবিত বিরোধ ও সংঘর্ষ এড়াইয়া কার্য্য-সম্পাদনের ব্যবস্থা করিয়া লয়। ইহার জন্য মিথ্যা দম্ভ, অভিমান বা জেদকে সে কখনও প্রশ্রয় দেয় না, সাময়িকভাবে স্বীয় সুচিন্তিত পন্থা, মতবাদ বা মর্য্যাদাকেও কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ করিতে সে কুণ্ঠিত হয় না, শেষ সাফল্যের দিকে তাকাইয়া। এই আপাত-পরাজয়কে সে সহকর্ম্মীদের অন্তর জয় ও কার্য্যসাধনের কৌশলরূপে স্বেচ্ছায়ই বরণ করিয়া লয় চরম বিজয় লাভের জন্য। মনে রাখিও, প্রত্যেক কার্য্যের চরম সাফল্যই প্রকৃত সাফল্য, শেষ জয়ই প্রকৃত জয়। বীর সে, শক্তিমান সে, যোগ্য নেতা সে, যে প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ প্রভৃতি প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয়। সমগ্র জগৎ তাহাকেই কৃতিত্বের পুরস্কার দেয়, বিধাতার আশীর্ব্বাদ তাহার শিরেই বর্ষিত হয়, সকলেই শেষে তাহাকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া নিজেদের অন্যায় আচরণের সংশোধন করিয়া লয়।

—ះ—

দুঃখ-দুর্য্যোগ

প্রকৃতি-জগতে যেমন মাঝে মাঝে প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা আসে, মানুষের জীবনেও তেমনি বিষম দুঃখ-দুর্য্যোগ উপস্থিত হয়। সময়ে সময়ে এই দুঃখ-দুর্য্যোগ এমনি প্রবল আকারে দেখা দেয় যে, মনে হয়—এবার বুঝি আর রক্ষা নাই, জীবন-তরী বুঝি বেসামাল হইয়া মাঝ দরিয়ায় বানচাল হইয়া যায়! মানুষ তখন এমনি হতভম্ব, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে যে, তাহার আর কোন হিতাহিত বিচার-বিবেচনা থাকে না, সে একেবারে দিশেহারা হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়ে। কিন্তু একটু ধৈর্য্য ধরিয়া, আত্মসংবরণ করিয়া থাকিতে পারিলেই অন্ততঃ তখনকার মত রক্ষা পাওয়া যায়। কেননা, প্রকৃতি-জগতে যেমন ঝড় ঝঞ্ঝা বেশী সময় থাকে না, মানুষের জীবনেও তেমনি দুঃখ-দুর্য্যোগ অধিককাল স্থায়ী হয় না; কিছু সময় পরেই ইহার অবসান ঘটে; তখন আসে মহাপ্রশান্তি। প্রকৃতি হয় নিথর, নিস্পন্দ, মনঃপ্রাণ হয় প্রশান্ত গম্ভীর। জীবনের সমস্ত ময়লামাটি তখন ধুইয়া মুছিয়া যায়; তাহার পরই সুরু হয় ধ্বংসের পর নূতন সৃষ্টির মত জীবনের নূতন অধ্যায়—পরিচ্ছেদ, প্রকৃত অগ্রগতি—উন্নতি।

দুঃখ-দুর্য্যোগ শ্রীভগবানের মহান্ আশীর্ব্বাদ। দুঃখ-দুর্য্যোগই মানুষকে আগুনের মত পোড়াইয়া পোড়াইয়া খাদমুক্ত করিয়া খাঁটি সোনায় পরিণত করে, দুঃখ-দুর্য্যোগই আঘাতের পর আঘাত দিয়া ভ্রান্তির নেশা ভাঙ্গিয়া জীবনকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ করিয়া গড়িয়া তোলে; দুঃখ-দুর্য্যোগের ভিতর দিয়া মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের আঁধার কাটিয়া যায়, জীবনের সমস্ত

ত্রুটি বিচ্যুতি ও গলদ দূর হইয়া মনঃপ্রাণ নির্ম্মল পবিত্র হয়। তখন মানুষের জীবনে এমন এক পরিবর্ত্তন, এমন এক ভাবের প্রেরণা আসে, যাহা দেখিয়া সে নিজেই অবাক হইয়া যায়।

দুঃখ-দুর্ভোগ মানুষের জীবনে এক মহাপরীক্ষা। দুঃখ-দুর্ভোগের সময়ই মানুষের বলবীর্য্য, বিক্রম-পরাক্রম, ধৈর্য্য-তিতিক্ষা, সাহস-অধ্যবসায়ের প্রকৃত পরীক্ষা হয়। সাধক জীবন-পথে ঠিক-ঠিক কতদূর অগ্রসর হইল ; অন্তরের পশুত্বকে দূরীভূত করিয়া দেবত্ব ও মহত্বকে কতখানি প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইল, তাহার প্রকৃত নির্ণয় হয় দুঃখ-দুর্য্যোগের দুঃসময়ে। জীবনের কতটুকু খাঁটি আর কতটুকু মেকী, তাহা এই সময় ধরা পড়িয়া যায়। তখন সাধক নিজের ভাব ও অবস্থা ঠিক ঠিক বুঝিয়া তদনুযায়ী সাধনা লইয়া চলিতে সক্ষম হয়।

দুঃখ-দুর্য্যোগ মানুষের জীবনে এক মহাশুভক্ষণ, শ্রীভগবানের সহিত যুক্ত হইবার এক পরম অবলম্বন। দুঃখ-দুর্য্যোগের ভিতর পড়িয়া মানুষ তাহার সমস্ত দোষত্রুটি, গলদ ও দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া সম্পূর্ণ নিরভিমান ও ভগবৎ নির্ভরশীল হইবার সুযোগ পায়, সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবার অবসর ঘটে।

দুঃখ-দুর্য্যোগই মানুষের পরম মিত্র। সুখ-শান্তি-প্রাচুর্য্য মানুষকে মদান্ধ করিয়া ভগবৎ-স্মৃতি ও আত্মকর্ত্তব্য ভুলাইয়া অধঃপতনের দিকে আগাইয়া দেয়, আর দুঃখ-দুর্য্যোগ মানুষকে আত্মস্মৃতি জাগাইয়া সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ, নিরভিমান ও ভগবন্মুখী করিয়া শ্রীভগবানের করুণাশীষ লাভের শুভ সুযোগ আনিয়া দেয়।

দুঃখ-দুর্য্যোগই সাধকের জীবনে উন্নতির পরিচায়ক। পার্ব্বত্যপথে চড়াই উৎরাই না আসা পর্য্যন্ত যেমন অগ্রগতি হয় না, তেমনি

জীবনপথেও দুঃখ-দুর্যোগ না আসিলে উন্নতি সুরু হয় না। যখনই দেখিবে যে, দুঃখ-দৈন্য-অসুখ-অশান্তি-বিপদাপদ আসিয়া চতুর্দ্দিক হইতে তোমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখনই বুঝিবে যে, এতদিন পরে তোমার জীবনের সত্যিকার অগ্রগতি, উন্নতি সুরু হইয়াছে। সুতরাং হতাশ হইও না, ভয়ে বিহ্বল হইয়া হাল ছাড়িয়া দিও না। ধৈর্য্য ধরিয়া সাহস করিয়া হাল ধরিয়া থাক, বীরের মত আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হও; শ্রীভগবান স্বয়ং আসিয়া তোমার সহায় হইবেন, সমস্ত বিপদাপদের ধুলি-জঞ্জাল ঝাড়িয়া সস্নেহে তোমাকে কোলে তুলিয়া লইবেন। জীবন তখন ধন্য ও কৃতার্থ হইবে---শান্তি, কল্যাণ ও শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া উঠিবে।

ছোটখাট দোষত্রুটি

স্বভাবের ছোটখাট দোষত্রুটি-গলদগুলিকেও কখন উপেক্ষা করিও না। কেন না, দৈনন্দিন জীবনের গতিপথে সেগুলিও মানুষকে কম হয়রান করে না।

বড় বড় দোষত্রুটিগুলি সহজেই ধরা পড়ে বলিয়া মানুষ অনায়াসেই সাবধান হইতে পারে, কিন্তু ছোটখাট ভুলত্রুটি সাধারণতঃ কাহারও দৃষ্টিতে আসে না, তাই মানুষ স্বভাবতই সেই বিষয়ে উদাসীন থাকে। ফলে, রোগজীবাণুর মত অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহা মানুষের জীবনের ভিত্তি ও চরিত্রের দৃঢ়তা শিথিল করিয়া দেয়। শুধু তাই নয়, ছোটখাট

াষত্রুটিগুলিই উপেক্ষার ফলে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া মারাত্মক হইয়া ঠে। তাই সাধককে এই বিষয়ে খুব সাবধান হইতে হইবে।

জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য কৃতী ছাত্রের পাঠাভ্যাসের মত ধকেরও নিয়মিতভাবে কঠোর সাধনাভ্যাসের প্রয়োজন। প্রতিদিন ভ্যুষে শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে স্বভাবের দোষত্রুটিগুলি নিরসন ও নধিগত গুণাবলী অর্জ্জনের জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে এবং ত্রিতে শয্যাগ্রহণের সময় সমস্ত দিনের কার্য্যাবলীর হিসাব-নিকাশ ও নসিক অবস্থার কতটুকু উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা বিচার বিশ্লেষণ রিয়া দেখিতে হইবে। এমনিভাবে প্রতিদিন দোষ-ত্রুটির পরীক্ষা সংশোধন এবং গুণের অনুশীলন করিতে থাকিলে ধীরে ধীরে ত্মাবিকশিত গোলাপের মত এমন একটি মহৎ জীবন গড়িয়া উঠিবে ার দীপ্ত মহিমায় সমগ্র দেশ ও জাতি সমুজ্জ্বল হইবে।

নূতন পাঠাভ্যাসের মত নূতন সাধনাভ্যাসেও প্রথম প্রথম খুব সুবিধা মনে হইবে, অনেক সময় এমন বিরক্ত ও অধৈর্য্য আসিবে যে, ব কিছু ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা করিবে, কখনও কখনও হয়তো হা অসম্ভব মনে হওয়ায় হতাশা নিরাশা দেখা দিবে; কিন্তু কিছুতেই চলিত হইও না। জন্মজন্মান্তরের বিরুদ্ধ প্রকৃতি ও সংস্কার, সুদীর্ঘ-লের বিপরীত অভ্যাস ও প্রচেষ্টা তুই একদিনেই দূর হয় না; এইজন্য ময়ের প্রয়োজন, সাধনার আবশ্যক। ধৈর্য্য ধরিয়া কিছুদিন চলিতে ারিলে, প্রারম্ভিক অসুবিধা ও কষ্ট দূর হইয়া সমস্ত বিষয় সহজসাধ্য ইয়া আসিবে। তখন ধীরে ধীরে বেশ উৎসাহ ও আনন্দ পাওয়া াইবে। এক একটি গুণ অর্জ্জন ও দোষ দূরীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে াধন-সাধল্যের নূতন শক্তি অনুভূতি হইতে থাকিবে এবং সাহস ও

আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসিবে। প্রাথমিক আড়ষ্টতা ও সঙ্কট কাটিয়া গেলে জীবনের যে দুর্দ্দমনায় গতিবেগ দেখা দিবে, তাহা আর কিছুতেই প্রতিহত হইবে না।

জীবন-গঠন-প্রচেষ্টায় সর্ব্বদা নির্ম্মম, নির্ভীক হইও। সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতিকেও কখনও রেহাই দিও না, একে একে ক্ষুদ্রতম দুর্ব্বলতাটিকে পর্য্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে সমূলে উৎপাটন করিও। দেখিও, কোথাও যেন কোন ফাঁক না থাকে। তাহা হইলে সেই ছিদ্রপথেই ধ্বংসের বীজ প্রবেশ করিয়া তোমার জীবনের সকল প্রচেষ্টাকে ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিবে।

বিবেকী ও অবিবেকী

বিবেক-বিচারবান্ ব্যক্তি সর্ব্বদা স্বীয় লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিব রাখিয়া জীবনের অপূর্ণ কর্ত্তব্য সম্পাদনে অধিকতর মনোযোগী হয়, তা বিবেকহীন মানুষ জীবনের লক্ষ্যের প্রতি অন্ধ ও উদাসীন হইয়া জরু দায়িত্ব সাধনে নিশ্চেষ্ট থাকে। বিবেকী প্রতিনিয়ত যথেষ্ট কিছু করিয়া মনে করে যে, জীবনের মহোচ্চ লক্ষ্য সাধনে উহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎক আর অবিবেকী সামান্য কিছু করিয়াই (কখনও বা না করিয়াও) ম করে যে, সে যথেষ্ট কিছু করিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহার জন্য সে ম মনে আত্মপ্রসাদ ও আত্মগৌরব লাভ করিয়া থাকে।

বিবেকীর সজাগ দৃষ্টি সর্ব্বদাই সম্মুখের দিকে সম্প্রসারিত, সে ব গুণে গুণান্বিত এবং অগাধ পাণ্ডিত্যে পণ্ডিত হইয়াও মনে করে

"অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্র সম্মুখে, আমি শুধু তীরে বসিয়া উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি।" আর অবিবেকী কোন গুণে গুণান্বিত বা বিন্দুমাত্র জ্ঞানের অধিকারী না হইয়াও ভাবে—"আমি অন্যের অপেক্ষা কম কিসে? আমার মত জ্ঞানী গুণী, বিচক্ষণ কয়জন আছে?"

বুদ্ধিমান ব্যক্তি অতীতে কি করিয়াছে না-করিয়াছে তাহার অযথা হিসাব-নিকাশ করিয়া অমূল্য সময়ের অপব্যবহার করে না, সে সর্ব্বদা বিচার করিয়া দেখে যে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইতে হইলে তাহাকে বর্ত্তমানে কি করিতে হইবে, কিভাবে অভাব-অভিযোগ-দোষ-ত্রুটি দূর করিয়া জীবনকে অতি দ্রুত আদর্শানুসারে গড়িয়া তোলা যাইবে। আর নির্ব্বোধ ব্যক্তি অতীতের কোন্ অজানা দিনের অজানা ক্ষণে লোক-চক্ষুর অন্তরালে বসিয়া কি করিয়াছে না করিয়াছে তাহাকেই জমকালো করিয়া ধরিয়া সকলের নিকট হইতে বাহাদুরী পাইতে ব্যস্ত, কিন্তু স্বীয় বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে গুরুতর কর্ত্তব্য সম্পাদনে একেবারেই অলস ও নিশ্চেষ্ট।

প্রকৃত বিদ্বান্, বিবেকী ব্যক্তি তাহার বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্য এবং স্বভাবের দোষত্রুটি-অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সচেতন, তাই সে সর্ব্বদাই বিনীত ও শিক্ষার্থী; আর প্রকৃত মূর্খ অবিবেকী ব্যক্তি তাহার দোষত্রুটি-অভাব-অভিযোগ,—এমন কি অজ্ঞতা সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অচেতন, উদাসীন ও অজ্ঞ, তাই সে কাহারো নিকট হইতে কোন কিছু শিখিতে অনিচ্ছুক।

প্রকৃত পণ্ডিত ব্যক্তি অন্যের ভিতরের গুণ আবিষ্কার করিয়া লইয়া নিজ জীবনে তাহা অনুশীলন করে, আর অজ্ঞ ব্যক্তি অন্যের সমস্ত গুণ ও মহত্বকে উপেক্ষা ও অস্বীকার করিয়া তাহার মধ্যে কোথায় কি দোষত্রুটি রহিয়াছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করে এবং নিজের ও অপরের

ক্ষতি করিয়া থাকে। প্রকৃত জ্ঞানী সর্ব্বদা অপরের নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া নিজের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করে, আর অজ্ঞানী অপরের নিকট ছোট হইবার ভয়ে নিজের অজ্ঞতাকে ঢাকিয়া স্বীয় অজ্ঞানতাকে বাড়াইয়া তুলিবার সুযোগ দেয়।

প্রকৃত মহান্, বিবেকী যে, সে আত্মপ্রশংসায় ক্ষুণ্ণ ও অপরের প্রশংসায় উৎফুল্ল হয়, আর সংকীর্ণচেতা অবিবেকী ব্যক্তি আত্মপ্রশংসায় উৎফুল্ল ও অপরের প্রশংসায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। মহৎ যে, সে অপরকে মহৎ ও বড় হইতে দেখিলে আনন্দিত হয় এবং সর্ব্বপ্রকারে তাহাকে সাহায্য করে, আর সংকীর্ণচেতা ক্ষুদ্রপ্রাণ ব্যক্তিই অন্যকে বড় হইতে দেখিলে ঈর্ষ্যানলে পুড়িয়া মরে ও নানাপ্রকার বাধা সৃষ্টি করিয়া তাহাকে দাবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। বিজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বদা সকলকে যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করায় সকলের নিকটে গৌরবান্বিত হয়, আর সাধারণ লঘুচিত্ত ব্যক্তি অন্যের নিকট ছোট হইবার ভয়ে নিতান্ত যোগ্য ব্যক্তিকেও শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদানে কুণ্ঠিত হইয়া অপরের নিকটও হেয় হয়।

এমনিভাবে বিবেকী ও অবিবেকী সর্ব্বদা শুধু বিচারের তারতম্যে এক জন ক্রমশঃই মহত্ত্বের তুঙ্গ শৃঙ্গে অধিরোহন করিতেছে, আর এক জন অনবরতই অধঃপতনের সুনিম্ন গহ্বরে নিপতিত হইতেছে। এক জন ক্রমশঃই সকলের শ্রদ্ধা-সম্মান, আদর-যত্ন ভালবাসা লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়া উঠিতেছে, আর একজন ক্রমশঃই সকলের নিকট হইতে অনাদর, অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষা লাভ করিয়া হেয় হইয়া পড়িতেছে। বিচারের ভুল কি সাংঘাতিক!

আত্মন্! বিবেকীর জ্ঞানচক্ষু ও সাবধানী দৃষ্টি লইয়া জীবনের ক্ষুরধার দুর্গম পথে পদক্ষেপ কর! অপরের পায়ের নীচ দিয়া চলিয়াও

যদি মহত্ত্ব অর্জ্জন করা যায়, তবে তুমি তাহাই কর; আর মাথার উপর দিয়া চলিয়াও যদি আদর্শচ্যুত, লক্ষ্যভ্রষ্ট, মনুষ্যত্বহীন হইতে হয়, তবে তুমি তাহাকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করিয়া চল। মনে রাখিও, অপরের নিকট বড় হওয়া বা ছোট হওয়ার দিকে দৃষ্টি দেওয়া মানুষের লক্ষ্য নয়, মানুষের লক্ষ্য—জীবনের চরম বস্তু, শ্রেষ্ঠতর মহত্ত্ব অর্জ্জন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে ছোট হওয়া, তাহা বড় হওয়ারই নামান্তর। এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া যে বড় হওয়ার চেষ্টা তাহা শুধু ছোট হওয়া নয়, আত্মধ্বংস বা আত্মহত্যা। প্রত্যেক বিষয়েরই পরিণাম দেখিয়া লাভ-লোকসান বিচার করিতে হয়। শেষ লাভ ও শেষ জয়ই প্রকৃত লাভ ও জয়। লালাবাবু তাঁহার সাংসারিক জীবনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট ভিক্ষাপাত্র হস্তে উপস্থিত হইয়া জীবনের চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ আত্যন্তিক নির্দ্বন্দ্ব স্বভাবই মহত্ত্বের পরিচায়ক। বিপুল ঐশ্বর্য্যের স্তূপের উপর স্পর্দ্ধা-উন্নত শিরে দণ্ডায়মান হইয়া যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে কোনদিন অবনত করা সম্ভব হয় নাই, সর্ব্বত্যাগী বিরাগীর দীনহীন বেশে ভিক্ষান্নের জন্য অবনত মস্তকে উপনীত হইয়াই তাহাকে অবনত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। বিষয় মদমত্ত স্পর্দ্ধিত শির এমনি ভাবেই ত্যাগ-মহিমা-সমুজ্জ্বল আদর্শের চরণ প্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া চিরন্তন মহত্ত্বের জয় ঘোষণা করে। সুতরাং আবারও বলি, সাবধান! আপাত-মনোরম পরিণাম-ভয়াবহ বিষয়-মরীচিকার কুহকে প্রলুব্ধ হইয়া বিপদকে ডাকিয়া আনিও না। আপাত-দুঃখময়, পরিণামে শান্তিস্বরূপ মহান্ মহত্ত্বের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া জীবনের চরম আকাঙ্খিত বস্তু—পরম শান্তি ও ভূমানন্দ লাভে যত্নবান হও।

জাগতিক ভালবাসা

জীবন-পথের অভিযাত্রী সাধক! এই স্বার্থ-মলিন জগতে তুমি কাহারও নিকট কখনও ভালবাসা চাহিও না, তোমার প্রাণভরা দরদ, প্রীতি ও স্নেহানুরাগের বিনিময়ে কাহারও নিকট আবার তাহা প্রত্যাশা করিও না। এখানে তোমার প্রীতি ও তৃপ্তির জন্য তোমাকে ভালবাসিবার, তোমার স্নেহানুরাগের জন্য তোমাকে দরদ করিবার লোক অতি বিরল। প্রত্যেকেই এখানে নিজেকে নিয়া অতিমাত্র ব্যস্ত; যার যেদিকে আসক্তি ও আকর্ষণ, যার যে-বিষয়ে প্রীতি ও তৃপ্তি সে সে-দিকে সেই বিষয়ে দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মাদের মত ছুটিয়া চলিয়াছে; যেখানে আপনার ভাব বা কল্পনানুরূপ প্রীতি ও তৃপ্তিকর কিছু পাইতেছে, সেখানেই সে (আনন্দ লাভের আশায়) আপনাকে বিলাইয়া, বিকাইয়া দিতেছে; যে পর্যান্ত কোন ঘাত প্রতিঘাত বা যাতনাকর প্রতিক্রিয়া উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত অন্য কোন দিকে মনোযোগ দিবার প্রবৃত্তি বা অবসর কাহারও নাই।

মানুষ ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসা চায়, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণের আকাঙ্খা করে, কিন্তু নিজের প্রীতি ও প্রয়োজন ব্যতীত অপরের প্রীতি ও প্রয়োজনের দিকে কেহ ফিরিয়া তাকায় না! বন্ধুতে বন্ধুতে, সখায় সখায়, প্রেমিক প্রেমিকায় কত না প্রেম-প্রীতি সোহাগ, অনুরাগ, দরদ, ভালবাসা—সাময়িক বিচ্ছেদ-ব্যবধানে কত না হা-হুতাশ, দুঃখ-মনস্তাপ, ক্ষণিকের অদর্শনে কত না উৎকণ্ঠা উচাটন! কিন্তু কয় দিন? দুই দিন যাইতে না যাইতেই নবানুরাগের মোহ

টুটিয়া যায়, আসক্তির বন্ধন শিথিল হইয়া আসে, পরস্পরের প্রীতি ও তৃপ্তি আবার ভিন্ন ধারা অবলম্বন করিয়া ভিন্নপথে ছুটিতে থাকে। তখন পূর্ব্ব বন্ধুর কথা আর স্মরণেও আসে না; তার আকুল আর্ত্তনাদ, মর্ম্মভেদী হাহাকার কেবল নির্ম্মম উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যানের প্রতিদান লইয়া গৃহকোণের জঞ্জালের মত দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। হায়, কত বিনিদ্র রজনী একত্র যাপন, নীরব নিভৃতে কত মধুর প্রীতি-আলাপন, কত আন্তরিক প্রেম নিবেদন—সবই তখন নৈশ স্বপ্নে পর্য্যবসিত। নবাগত বন্ধুর নূতন প্রীতি অনুরাগ তখন পুরাতনের প্রীতি অনুরাগকে পথের ধুলায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া আপনাকে তাহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে। আবার নূতন অঙ্কের নূতন অভিনয় সুরু হইতে থাকে। ইহাই জাগতিক স্বার্থপঙ্কিল ভালবাসার চিরন্তন নিয়ম।

পিতা পুত্রকে স্নেহ করে, স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে, কেননা, তাহারা তাহাতে প্রীতি অনুভব করে। বস্তুতঃ ইহার মূলেও নিজের প্রীতি ও তৃপ্তিই বিদ্যমান; পুত্র বা স্ত্রীর প্রীতি বা তৃপ্তি নয়। আর তাহা কি করিয়াই বা সম্ভব? কামনাযুক্ত মানুষ যেখানে বাতাহত তৃণের মত কামনা-বাসনা-আশা-আকাঙ্খা দ্বারা তাড়িত হইয়া প্রতিনিয়ত কেবল বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তাহার আবার অপরকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিবার স্বাধীনতা কোথায়? সেই সামর্থই বা কই? বাসনার ক্রীতদাস মানুষ ভালবাসার নামে আপনার বাসনার চরিতার্থতার জন্যই উদ্‌গ্রীব। (ক্রীতদাস হিসাবে তাহাই সে করিতে বাধ্য, না করিয়া উপায়ান্তর নাই) তাই সে প্রতিনিয়ত স্বীয় কল্পনা ও কামনানুরূপ কতকগুলি ভাবের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে, আর যখন যেখানে যাহার ভিতর যতটুকু তাহা পাইতেছে তখন সেখানেই তাহাতে ততটুকু

মজিয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ, এ ভালবাসা—স্বীয় অন্তরস্থিত স্ব-কপোল-কল্পিত কতকগুলি ভাবের উপর ভালবাসা, একটা মানসিক বৃত্তি। মানুষ ভালবাসার নামে আপনার অন্তরের প্রীতিকর কতকগুলি অশরীরী ভাবকে অপরের ভিতরে আরোপ করিয়া তাহাকে শরীরী করিয়া তুলিয়া স্বীয় বাসনা চরিতার্থ করে। যতদিন পর্য্যন্ত যাহার উপর এই ভাবগুলি যতটুকু আরোপিত হয়, ততদিন পর্য্যন্তই তাহার উপর ততটুকু ভালবাসা থাকে। তাহার প্রতি কথা কানে সুধা ঢালিয়া দেয়, তার হাসি, তার হাবভাব অঙ্গস্পর্শ সব কিছু যেন মধুর হইতে মধুরতর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কিছুকাল পরেই যখন সেই আরোপিত ভাবগুলি রূপান্তরিত হইয়া নূতন পাত্রে পাত্রান্তরিত হয়, তখন তাব সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসাও পাত্রান্তরিত হইয়া থাকে। ইহাই জাগতিক ভালবাসার বীভৎস নগ্নমূর্ত্তি। এই ভালবাসার শান্তি ও আনন্দ ততক্ষণই অক্ষুণ্ণ থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ের স্বার্থ অভিন্ন থাকে এবং পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের বাসনা পূর্ণ ও প্রীতি চরিতার্থ হয়। কিন্তু যখনই একজনের ভালবাসা অক্ষুন্ন থাকে এবং অপরের ভালবাসা পাত্রান্তরিত হয়, পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের প্রয়োজন পূরণের ব্যাঘাত ঘটে, তখনই ঈর্ষ্যাব আগুন জ্বলিয়া উঠে, অশান্তির ঝড় দেখা দেয়। এমনি ভাবে কামনাসক্ত মানুষ দিনের পর দিন অন্তঃসারহীন মিথ্যা ভালবাসার পণ্য লইয়া নিজেকে ও অপরকে শুধু প্রতারণা করিয়া বেড়াইতেছে। সেই কামগন্ধহীন, নিঃস্বার্থ স্বর্গীয় প্রেম-প্রীতি-ভালবাসাকে কামমলিন জগতে টানিয়া আনিয়া বাসনা ও স্বার্থের পীড়নে বৃথাই কেবল অবমাননা করিতেছে। এখানে প্রকৃত ভালবাসা নাই, কাহারও জন্য কাহারও সত্যিকার প্রেম প্রীতি দরদ সহানুভূতি নাই,—শুধু ভান, শুধু

প্রবঞ্চনা প্রতারণা, মরুভূমির মায়া মরীচিকা! তাই এ-ভালবাসায় নিরবচ্ছিন্ন সুখ শান্তি আনন্দ নাই, আছে অসুখ অশান্তির তীব্র দাবদাহ। মানুষ ভালবাসার নামে সংশয়-সন্দেহ-অবিশ্বাস, ঈর্ষা-বিদ্বেষ-পরশ্রী-কাতরতা, বিচ্ছেদ, উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যানের তুষানলে প্রতিনিয়ত জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে, কিন্তু তবুও তাহার হুঁস নাই! আত্মবিস্মৃতির মোহঘোর কাটাইবার কোন চেষ্টা যত্ন উদ্যোগ পর্যান্ত নাই। আঘাতের পর আঘাত খাইয়াও সে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় মোহ-গহ্বরে ছুটিয়া চলিতেছে দিনের পর দিন।

সাধক! তুমি কখনও জাগতিক ভালবাসার কাঙাল সাজিও না। তোমার পবিত্র প্রেমপাত্র লইয়া কখনও কামমলিন স্বার্থ-মূঢ় মানুষের দ্বারে উপস্থিত হইও না। এই জগতে যদি কাহাকেও ভালবাসিতে হয়, তবে তুমি শুধু তাঁহাকেই ভালবাসিও, যিনি—

"বিপন্নের ত্রাণকর্ত্তা নিরাশ প্রাণের আশা,
পাপপথে পরিশ্রান্ত ভ্রান্ত পথিকের ভরসা।"

আর যদি কাহারও ভালবাসা পাইতে কখনও সাধ হয়, তবে তাহা ভগবানের কাছেই চাহিও, তিনি তোমার অপূর্ণ হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিবেন! এই জগতে তোমার কল্যাণ ও প্রীতির জন্য তোমাকে ভালবাসিবার, তোমার প্রাণের জ্বালা বুঝিয়া তোমাকে দরদ করিবার যদি কেহ থাকে, তবে আছেন মাত্র সেই একজন। তিনি সকলের সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, আশা-নিরাশায় তুল্য বন্ধু; জীবনে-মরণে, শয়নে-স্বপনে নিত্যসাথী। জীবনের ঘোর দুর্দ্দিনে কালবৈশাখীর প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝাপূর্ণ বিভীষিকাময়ী রজনীর অমান্ধকারে যদি তোমার একে একে সকলেই পরিত্যাগ করে, তথাপি তিনি কখনও তোমাকে

পরিত্যাগ করিবেন না। বিপদ যতই ঘনাইয়া আসে, দুঃখ-দুর্দ্দশা যতই চরমে উপস্থিত হয়, অশান্তির দাবানল প্রাণমনকে যতই অধীর অস্থির করিয়া তোলে ততই তাঁহার করুণা উচ্ছলিত হইয়া উঠে। তিনি কাছে আগাইয়া আসেন, ত্রস্তহস্তে চোখের জল মুছাইয়া দিয়া শান্তি ও সান্ত্বনায় সমগ্র অন্তর ভরিয়া তোলেন। সেখানে কোন প্রবঞ্চনা প্রতারণা নাই, দুঃখ-দৈন্য-অসুখ-অশান্তি হাহাকার নাই, নাই কোন উপেক্ষা অনাদর ও যাতনাকর প্রতিক্রিয়া ; সেখানে আছে কেবল শান্তি, শান্তি, আনন্দ, আনন্দ—নির্ম্মল, নিরবচ্ছিন্ন, পরিপূর্ণ আনন্দ। সেখানে কোন ভেদ-বৈষম্য নাই, বিরহ-বিচ্ছেদ-ব্যবধান বা প্রত্যাখ্যান নাই, সেখানে কেবল মিলন, মিলন, বিরামহীন চিরমহামিলনের কালজয়ী চিরসুখ-প্রবাহ! সেই স্বর্গীয় নিষ্কলুষ ভালবাসা চাহিলে, আপনাকে সেখানে রিক্ত করিয়া ঢালিয়া দিলে, সেই পূত প্রীতিস্পর্শে তুমি পবিত্র হইবে, তোমার জীবন-জনম ধন্য ও কৃতার্থ হইবে, হৃদয় মন সর্ব্বদা মহানন্দে ভরিয়া থাকিবে।

দুশ্চিন্তার মোহ

চিন্তাই মানুষের সুখদুঃখের নিয়ামক। একই ঘটনাসংঘাতে কেহ কেহ অস্থির, উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছে, আবার কেহ পরম নিশ্চিন্ত মনে শান্তিসুখে কাল কাটাইতেছে। একই অবস্থায় পড়িয়া কেহ অশান্তির আগুণে পুড়িয়া মরিতেছে, আবার কেহ নিরুদ্বিগ্নচিত্তে মহানন্দে

অবস্থান করিতেছে। ঘটনা ও অবস্থা যাহাই হউক না কেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ চিন্তানুযায়ী শান্তি ও অশান্তি ভোগ করিতেছে; যে যে-প্রকার চিন্তাকে ভিতরে প্রশ্রয় দিতেছে, সে সেই প্রকার ফল লাভ করিতেছে। ইহাতে বাহিরের ঘটনা বা অবস্থার প্রভাব যতখানি থাকুক না থাকুক, প্রকৃতপক্ষে নিজের উপর নিজের প্রভাব—স্বীয় আত্মশাসনের ক্ষমতা বা অক্ষমতাই (মাত্রাবিশেষ) কার্য্যকরী হইতেছে। সুতরাং বৃথা দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ও অশান্তির দ্বারা মনকে কখনও অযথা ভারাক্রান্ত করিও না। কারণ, তাহাতে অশান্তির জ্বালা বৃদ্ধি পায় বৈ কমে না।

দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনারও মস্ত বড় একটা মাদকতা আছে। একবার কোনক্রমে ইহা কাহাকেও আক্রমণ করিবার সুযোগ পাইলে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে; ক্রমে মন দুর্ব্বল হয়, বিচারবুদ্ধি লোপ পায়, অবশেষে মানুষ স্বীয় শক্তি সামর্থ, শান্তি আনন্দ, এমন কি স্বাস্থ্য পর্য্যন্ত হারাইয়া অসাড়, অকর্ম্মণ্য, নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। তখন কোন কাজকর্ম্ম, এমন কি নিতান্ত প্রিয়জনের সঙ্গ, বাক্যালাপ পর্য্যন্ত ভাল লাগে না! যে-জাতীয় চিন্তা-ভাবনা বা অনুধ্যান মনকে সবল, সতেজ ও উৎসাহপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে, তাহাও বিষবৎ মনে হয়। মানুষ যেন অবশ হইয়াই আপনার অজ্ঞাতসারে নির্জ্জন স্থান খুঁজিয়া লইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে বসিয়া শুধু ভাবিয়া ভাবিয়া কাল কাটাইতে চায়। তাহাই তাহার তখন ভাল লাগে, কিছুতেই সে তার দুশ্চিন্তা ও নির্জ্জন আশ্রয় স্থান ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতে চায় না।

দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা মানুষের এক প্রকার উৎকট ব্যাধি। অঙ্কুরেই ইহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত না হইলে ইহার কবল হইতে আত্মোদ্ধার করা নিতান্ত কঠিন হয় এবং বিষময় ফল ফলিতে সুরু করে। তাই

প্রথম আক্রমণেই ইহাকে প্রাণপণে বাধা দিতে হইবে। যে জাতীয় চিন্তাভাবনা দ্বারা জীবনের কোন উন্নতি বা লাভ নাই, যাহা আমাদিগকে উত্তরোত্তর উৎসাহদীপ্ত ও উদ্যম-সম্পন্ন করিয়া জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী করিয়া তোলে না, যাহার দ্বারা বুদ্ধি মলিন, বিচারশক্তি নিস্প্রভ, শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ, মন দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইতে থাকে তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

দৈনন্দিন জীবনে যেমন বিভিন্ন কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন সময় নির্দ্দিষ্ট থাকে, তেমনি বিভিন্ন প্রকার গুরুতর চিন্তার জন্যও বিভিন্ন সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদনের মত নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট চিন্তা করিতে হইবে। যে চিন্তা যখন আবশ্যক (যাহা অন্য সময়ে করা প্রয়োজন) সেই চিন্তা তখন মনে স্থান দিবে না। কোনও সময় অনাবশ্যক, অবান্তর চিন্তা-ভাবনা আসিয়া মনকে বিব্রত করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইলে তাহাকে জোরপূর্ব্বক তাড়াইয়া দিয়া নির্দ্দিষ্ট চিন্তায় মনোনিবেশ করিবে। এতদ্ব্যতীত, যে বিষয়ে যখন যতটুকু চিন্তা করা প্রয়োজন, সেই বিষয়ে তখন ততটুকু চিন্তাই করিবে, তদতিরিক্ত নয়। ইহাতে ধীরে ধীরে মনোবৃত্তির উপরে একটা আধিপত্য জন্মিবে এবং চিন্তার ধারা ক্রমশঃ সুশৃঙ্খল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়া তোমাকে বাজে চিন্তার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে।

কখনও কোনও গভীর শোকতাপ বা বিপদাপদের দুর্ভাবনা মনকে পাইয়া বসিলে তাহাতে অভিভূত না হইয়া সযত্নে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ও সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করিও। মনে রাখিও—কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ বা সমস্যার সমাধানই চিন্তার উদ্দেশ্য, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত বা সমস্যার সমাধান হইয়া গেলে বীরের মত পৌরুষ সহকারে তদনুসারে কার্য্য

করায়ই বিপন্মুক্তির সম্ভাবনা, অন্যথায় শোকতাপ বা বিপদের দুর্ভাবনা ভাবিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বৃথা সময় কাটাইলে অথবা শুধু শুধু বুক চাপড়াইয়া হা-হুতাশ করিলে কখনও বিপদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। উদ্যোগী পুরুষ-সিংহই স্বীয় অসাধারণ পৌরুষবলে বিপদাপদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আকাঙ্ক্ষিত জিনিষ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বৃথা চিন্তায় সময় ও শক্তি ক্ষয় না করিয়া বিপন্মুক্তির চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা সফল করিয়া তুলিবার জন্য যে চিন্তা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সাহায্য করে, যে চিন্তা-ভাবনা শত সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জীবন-পথে চলিতে সাহস ও প্রেরণা দেয়; যাহা দুস্তর সংসার-বারিধিবক্ষে দিশাহারা মানবের দিগ্‌দর্শনস্বরূপ, সেই জাতীয় চিন্তা ভাবনাকেই সর্বপ্রযত্নে অন্তরে স্থান দিতে হইবে, প্রতিনিয়ত তাহারই অনুশীলন করিতে হইবে। আমি যখন আমার প্রভু, তখন আমার ভিতরে কোনপ্রকার চিন্তার স্থান দানের স্বাধীনতাও আমারই। সুতরাং আমার ভিতরে আমি বলবীর্য্যহরণকারী দুশ্চিন্তাকে স্বেচ্ছায় স্থান দিব কেন? জীবনহননকারী দুর্ভাবনাকে প্রশ্রয় দিয়া স্বেচ্ছায় স্বহস্তে নিজের শ্মশান-শয্যা রচনা করিব কি জন্য? আমি যদি আমার মনের কবাট বন্ধ করিয়া দেই, তবে আর সেখানে কে প্রবেশ করিতে পারে? এমনিতর বিচারের দ্বারা হৃদয়দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া ভগবানের নাম জপ ও ভগবচ্চিন্তায় ডুবিয়া থাকিয়া দুশ্চিন্তার মোহ-কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, তাহা হইলেই ভিতরে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

—:o:—

কর্ত্তব্য সাধন

মানুষের জীবনকাল সুনির্দ্দিষ্ট ; প্রতিনিয়ত সেই সুনির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জীবনকাল হইতে তিলে তিলে পলে পলে আয়ু ক্ষয় হইয়া জীবনাবসানের নির্দ্দিষ্ট দিনটি আগাইয়া আসিতেছে। দিন মাস বৎসর ঘুরিয়া যে পরিমাণ বয়স বাড়িতেছে ঠিক সেই পরিমাণে দিন মাস বৎসর হিসাবে প্রতি মুহূর্ত্তে জীবনকাল কমিয়া যাইতেছে। সুতরাং হেলায় খেলায় দিন কাটাইও না, ক্ষণকালও বৃথা ব্যয় করিও না। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হও, জীবনে যাহা কিছু করণীয় আছে তাহা এই মুহূর্ত্তেই করিতে আরম্ভ কর। 'আজ করি, কাল করি' ভাবিয়া সময় কাটাইলে, সুযোগ সুবিধার আশায় বৃথা বসিয়া থাকিলে, অবশেষে একদিন দেখিবে—ধীরে ধীরে এই পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত, অথচ তোমার অভীষ্ট কর্ত্তব্য সমস্তই বাকি। তখন শুধু বৃথা হা-হুতাশ, দুঃখ-মনস্তাপ করিতে করিতেই শেষ নিঃশ্বাস বহির্গত হইবে ; কোন কিছু করিবার আর সময় থাকিবে না।

বর্ত্তমানই কর্ত্তব্য-সাধন পক্ষে প্রকৃত সময়। এই প্রকৃষ্ট সময়কে উপেক্ষা করিয়া অনাগত ভবিষ্যতের কল্পিত সুযোগ সুবিধার আশায় বসিয়া থাকিলে সে সুযোগ-সুবিধা আর কখনও আসিবে না ; অসুবিধার পর কেবল অসুবিধা দেখা দিবে, নিত্য নূতন বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইবে, উৎসাহ উদ্যম ধৈর্য্য ও কর্ম্মশক্তি একে একে অন্তর্হিত হইবে। সুতরাং জীবনের অভীপ্সিত কার্য্যকে কখনও ভবিষ্যতের আশায় ফেলিয়া রাখিও না।

আরব্ধ কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া অন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিও না। যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছ তাহা শেষ করিয়া তবে অন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে। তাহা না হইলে এমন সব আবিলতা আসিয়া জুটিবে, যাহাতে সেই অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার সুযোগ সুবিধা আর পাওয়া যাইবে না। আবার পাওয়া গেলেও পুরাতন অসম্পূর্ণ কাজে উৎসাহ ও ধৈর্য্যের অভাবে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা হইবে না; কেননা, এ জগতে বড় বড় কাজ করিবার সময় সুযোগ অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু অসমাপ্ত ছোটখাট কাজ করিবার মত সুযোগ-সুবিধা ও উৎসাহ অতি বিরল। তাই ছোটখাট কাজ যাহা ভবিষ্যতের আশায় অসম্পূর্ণ পড়িয়া থাকে, তাহা আর সহজে সম্পূর্ণ হয় না।

কাজের প্রাথমিক সাফল্যে গর্ব্বিত হইও না। কারণ, এই তো মাত্র জীবনের আরম্ভ, অনেক বড় বড় কাজ এখনও বাকি। যে ব্যক্তি সামান্য দুই একটি কাজে সাফল্য লাভ করিয়াই গর্ব্বে অন্ধ ও উৎসাহে আত্মহারা হয়, তাহার জীবনে বড় বড় কাজের স্থায়ী গৌরব অর্জ্জন সম্ভব হয় না। কোরকেই সেই কুসুম ঝরিয়া পড়ে, বোধনেই বিসর্জ্জনের বাজনা সুরু হয়, প্রারম্ভেই সেই জীবনের সমাপ্তি ঘটে। সুতরাং সর্ব্বদা সাধারণ ছোট ছোট কাজে শক্তি, সাহস ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চয় করিয়া বৃহত্তর, মহত্তর কর্ত্তব্য গ্রহণে অগ্রসর হও—শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া জীবনকে প্রকৃত সাফল্য-গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া তোল। ইহাই কর্ত্তব্য সাধন ও ক্রমোন্নতি লাভের উপায়।

——:✻:——

ব্যর্থতা ও পরাজয়

ব্যর্থতা ও পরাজয়ের ভিতর দিয়াই জীবনের চরম সার্থকতা ফুটিয়া উঠে, ভুল-ত্রুটি অকৃতকার্য্যতার মধ্য দিয়াই মানুষ একদিন সাফল্যের পরম গৌরব লাভ করে। সুতরাং জীবন-সাধনার সাময়িক ব্যর্থতা ও পরাজয়ে কখনও হতাশ বা মুহ্যমান হইও না।

জীবনের পথ বড় বন্ধুর, বড় বিপদসঙ্কুল। দুঃখ-বিপর্যয়, বিপদাপদ, ব্যর্থতা ও পরাজয় সেখানে মানুষের নিত্যসাথী। কিন্তু বীর যে, লক্ষ্য-সাধনায় কৃতসঙ্কল্প যে, সে তাতে ভ্রূক্ষেপ করে না। যে উঠিতে যায় সে-ই পড়ে, যে পথে চলে সে-ই হুচোট খায়, ক্ষুরধারের ন্যায় শাণিত দুর্গম জীবন-পথে অতি বড় সাবধানীর পদও অনেক সময় ক্ষত-বিক্ষত শোণিতাক্ত হয়, জীবনের কঠোর অগ্নি পরীক্ষায় অতি বড় বীরকেও কখনও কখনও পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। কি হয় তাতে? প্রকৃত বীর যে, সে কি তাতে ভয় পায়? জীবন-পথের সত্যিকার পথিক যে, সে কি সেদিকে ফিরিয়া তাকায়, না থমকিয়া দাঁড়ায়? তার সেই সময়, সেই অবসরই বা কোথায়? জীবনের দিন নির্দ্দিষ্ট, আয়ু অতি সীমাবদ্ধ। তাহাতে শক্তি-সামর্থ্য, মেধা প্রতিভা প্রতিনিয়ত হ্রাস পাইতেছে, জরা-ব্যাধি মৃত্যু আসিয়া ভ্রূকুটি ভয়াল করাল মুখ ব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত হইতেছে, সম্মুখে দুরতিক্রম্য সুদীর্ঘ জীবন-পথ, জীবন-লক্ষ্য এখনও দূরে—অতি দূরে। সুতরাং বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি বৃথা হা-হুতাশ দুঃখ-মনস্তাপে সময় ও শক্তি নষ্ট করে না। সে বীরবিক্রমে সমস্ত বাধাবিঘ্ন, বিপদ-আপদকে পায়ে দলিয়া, ব্যর্থতা ও পরাজয়কে অগ্রাহ্য

করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হয়। যত বার পড়ে, তত বার ওঠে, তত বার চলে। এক একবার পড়ার সঙ্গে, এক এক ধাপ পশ্চাৎপদ হওয়ার পর আগাইয়া যাওয়ার জন্য শত সহস্র গুণ চেষ্টা যত্ন, অনন্ত অফুরন্ত উৎসাহ-উদ্যম, আকুলতা-ব্যাকুলতা, সাহস ও অধ্যবসায় জাগরূক হয়। কাহারও ভ্রূ ভঙ্গীতে সে দমে না, কাহারও নিরুৎসাহ-বাণীতে সে টলে না ; কারণ সে জানে—অকৃতকার্য্যতাই কৃতকার্য্যতার সোপান (Failures are the pillars of success)।

'Struggle is life,'—সংগ্রামই জীবন। নিথর, নিস্পন্দ, প্রাণহীন যে, জড় পদার্থের মত নিশ্চল গতিহীন যার জীবন, তার নিকটই কোন ঝড়ঝঞ্ঝা বিপদাপদ আসে না, জয়-পরাজয়, উত্থান-পতনের কোন প্রশ্নই সেখানে উঠে না। কিন্তু পার্ব্বত্য নদীর মত দুর্ব্বার গতিশীল যার জীবন, প্রতিনিয়ত মহান্ লক্ষ্যের দিকে উদ্দাম গতিতে আগাইয়া চলিতেছে যে, তাহার সম্মুখেই সমস্ত বাধাবিঘ্ন বিপদাপদ দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতের মত মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়ায়, তাহাকেই দুস্তর কানন-কান্তার, গিরি-গহ্বর, সাগর-পর্ব্বত, মরু-প্রান্তর ভেদ করিয়া জীবনের গন্তব্য পথে ছুটিতে হয়। জীবন-লক্ষ্যের সন্ধানী সাধক তাই ঝড়ের নৌকার মাঝির মত মহাদুর্য্যোগের উন্মাদ হাওয়ায় পাল তুলিয়া দিয়াই জীবনের পথে জয়যাত্রা সুরু করে। মাথার উপরে বজ্র কড়্‌কড়্‌ করে, বিদ্যুৎ-চমকে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, কালবৈশাখীর প্রলয়-ঝঞ্ঝা রুদ্রতালে মাতিয়া উঠে, বিশাল বারিধির উত্তাল তরঙ্গমালা সরোষে ফেনিল উচ্ছ্বাসে গর্জ্জিয়া আসে—কিন্তু সাধক নির্ভীক, নির্ব্বিকার, কোন দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই ; দুর্জ্জয় সাহসে ভর করিয়া, সর্ব্ব প্রকার দুঃখ-বিপত্তিকে মাথায় লইয়া, সমস্ত বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে

করিতে সে আগাইয়া চলে সম্মুখের দিকে দৃষ্টি সম্প্রসারিত রাখিয়া। বীর যোদ্ধার যেমন সংগ্রামেই আনন্দ, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেই যেমন তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরম উল্লাসে নাচিয়া উঠে, বীর সাধকেরও তেমনি বিপদেই আনন্দ, বাধাবিঘ্ন ঘাত-সংঘাত আসিলেই তাহার ভিতরে সিংহশক্তি হুঙ্কার দিয়া উঠে। প্রতি মুহূর্ত্তের সংঘর্ষের ভিতর দিয়া সে আহরণ করিয়া চলে লক্ষ্যসিদ্ধির অমোঘ শক্তি, সাহস ও অধ্যবসায়।

ভীরু কাপুরুষ যে, সে-ই সংগ্রামে ভয় পায়, জীবন-সাধনায় অনভিজ্ঞ যে, সে-ই ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানিতে ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তি জানে ও বুঝে—দুঃখ-দৈন্য, অসুখ-অশান্তি, ব্যর্থতা ও অকৃতকার্য্যতা কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সাধকের জীবনে উহা কঠোর পরীক্ষা, অগ্রগতির স্তর। এই সমস্ত শুধু মানুষের বলবীর্য্য, বিক্রম পরাক্রম, সাহস-ধৈর্য্য, উৎসাহ-উদ্যম-অধ্যবসায়ের পরিমাপ করে, উন্নতি অভ্যুদয় ঠিক ঠিক হইতেছে কিনা তাহার পরীক্ষা করে, আত্মসম্বিৎ ফিরাইয়া আনিয়া সাধককে তাহার প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার সুযোগ দেয়। ব্যর্থতা ও পরাজয়ের ভিতরে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত থাকে। তাই প্রতিবারের ব্যর্থতা সাধককে তার পরবর্ত্তী চেষ্টায় সাহায্য করে, শক্তি সঞ্চার করে।

আত্মন্! তুমি তোমার হতাশা-নিরাশা, দুঃখ-দৈন্য, বিষাদ-অবসাদ গ্লানি-মনস্তাপকে জন্মের মত বিদায় দাও। ক্লৈব্য-দৌর্ব্বল্যকে সবলে দূরে নিক্ষেপ করিয়া একবার বীরের মত মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াও। জীবনের মহান্ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে যুধ্যমান্ বীর সৈনিক তুমি, পিছনে হটিবার আদেশ নাই, গন্তব্যস্থান সশস্ত্রসৈন্যসুরক্ষিত শত্রুব্যূহের পশ্চাতে

—দিগ্‌দিগন্তহীন অনন্ত সম্মুখে। অগ্রসর হও, অগ্রসর হও, নূতন আশায় বুক বাঁধিয়া পূর্ণোৎসাহে ভর করিয়া ভীমপ্রভঞ্জন গতিতে অগ্রসর হও। মনে রাখিও—

> "—দুঃখ আছে কত, বিঘ্ন শত শত
> জীবনের পথে সংগ্রাম সতত,
> চলিতে হইবে পুরুষের মত,
> হৃদয়ে বহিয়া বল ভাই
> আগে চল আগে চল ভাই।"

কিসের ভয়? কিসের সংকোচ? একবার স্মরণ কর সেই পুরুষ-সিংহ স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রগম্ভীর আশ্বাসবাণী—"Be not discouraged, onward, onward, upon ages of struggle a character is built."

"হতাশ হইও না। আগাইয়া যাও, আগাইয়া যাও, বহুকালের সংগ্রাম-সংঘর্ষের ভিতর দিয়াই এক একটি মহান্ চরিত্র গড়িয়া উঠে।"

নিজেকে ক্ষুদ্র ভাবিও না, অসহায় নিরাশ্রয় মনে করিও না। যদি ঠিক ঠিক ভাবে চলিতে পার, তবে জীবন-পথে তোমাকে সাহায্য করিবার, দুর্দ্দিনে দুঃসময়ে আশ্রয় ও সান্ত্বনা দিবার মত লোকের কখনও অভাব হইবে না। ঐ শুন যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দের মাভৈঃ মন্ত্র—"রিপুদমন ও ইন্দ্রিয়-সংযমের ভিতর দিয়া যাহারা মনুষ্যত্বের সাধনায় ব্রতী, তাহারা আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর। আমার শক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাহাদিগকে সুদৃঢ় বর্ম্মের মত রক্ষা করিবে।"

গভীর নিশীথে, নীরব নিভৃতে মনপ্রাণকে ভগবন্মুখী কর, সমস্ত অন্তর দিয়া তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা কর, শরণাগতবৎসল তিনি জীবনের

ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানি মুছাইয়া আশ্বাস ও সান্ত্বনায় প্রাণমন জুড়াইয়া তোমার ভিতরে পথ চলার মত সাহস ও শক্তি সঞ্চার করিয়া দিবেন। ওঁ শম্।

—:০:—

চিরদিন কাহারও সমান যায় না

মানুষের জীবন কখনও নিরবচ্ছিন্ন সুখ শান্তি, স্বাস্থ্য সম্পদ, আরাম-বিরামের ভিতর দিয়া কাটে না। মাঝে মাঝে দুঃখ দৈন্য, অসুখ অশান্তি, বিপদাপদও দেখা দেয়। রাজা, প্রজা, ধনী দরিদ্র, বিদ্বান মূর্খ, সাধু অসাধু নির্ব্বিশেষে সকলের জীবনেই এই সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থা সমভাবে উপস্থিত হয়, কাহারও জীবনে (শুধু রাজা, বিদ্বান বা সাধু বলিয়া) কখনও বড় একটা ব্যতিক্রম দেখা যায় না। আজ যে বিরাট রাষ্ট্রের কর্ণধার, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, কাল হয় তো সে-ই এক ভীষণ লৌহার্গলবদ্ধ কারাগারের সশস্ত্র শাস্ত্রী-সুরক্ষিত অন্ধকার প্রকোষ্ঠে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। আজ যে শত সহস্র ব্যক্তিকে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করিতেছে, কাল হয়তো সে-ই কপর্দ্দকহীন অবস্থায় নিদারুণ জঠর-জ্বালায় পীড়িত হইয়া একমুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। এখন যাহার লৌহদৃঢ় প্রকাণ্ড শরীর শত শত ব্যক্তির প্রাণে ভীতির সঞ্চার করিতেছে, কিছুকাল পরেই হয় তো দেখা যাইবে যে, তাহার রোগ-জীর্ণ শরীর শয্যাত্যাগ করিবার জন্য অপরের সাহায্যের অপেক্ষা করিতেছে। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে ইহাই সকলের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা।

কিন্তু মদান্ধ মানুষ তাহা দেখিয়াও বুঝে কই, বুঝিলেও তদনুসারে কাজ করে কোথায়? স্বাস্থ্য, সম্পদ, পদমর্য্যাদার গৌরবে উন্মত্ত হইয়া 'ধরাকে সরা' জ্ঞান করিয়া সে জগতের বুকে অসহায়, দুর্ব্বল, বুভুক্ষু রুগ্নকে শুধু আঘাতের পর আঘাত দিয়া পীড়ন করিয়াই চলিতেছে! একবারও সে চিন্তা করিবার অবকাশ পায় না যে, কালচক্রের আবর্ত্তনে তাহারও অবস্থান্তর ঘটিতে পারে। অবশেষে যখন সত্য সত্যই মহাকালের প্রচণ্ড আঘাতে একদিন শক্তি-সামর্থ্য, স্বাস্থ্য-সম্পদ-ঐশ্বর্য্য ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন সে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ভগবানের উপর দোষারোপ করে; কিন্তু একবারও স্বীয় দুষ্কৃতির কথা ভাবে না, অন্যায়ের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে অগ্রসর হয় না। তাই অপরাধের উপর অপরাধ বাড়িয়া যায় এবং মানুষ আরও দুর্ভোগ প্রাপ্ত হয়।

জীবন-সাধনার সাধক! তুমি কখনও অনাগত দুর্দ্দিন ও দুরবস্থার কথা ভুলিয়া অহঙ্কার অভিমানে স্ফীত হইও না; যতদূর পার নিরভিমান চিত্তে সহানুভূতির সহিত অপরের সেবা ও সহায়তা কর। আর যদি কিছু না করিতে পার, তবে অন্ততঃ দুইটী সহানুভূতিপূর্ণ মিষ্ট কথা শুনাও, তোমার অন্তরের দরদ প্রীতি ও ভালবাসা জানাও, নিজে না পারিলেও অপরের দ্বারা যাহাতে কিছু উপকার হয় তাহার ব্যবস্থা কর। তাহা হইলে তোমার সহানুভূতিপূর্ণ মধুর ব্যবহারে সে তাহার জ্বালা-মালাপূর্ণ জীবনে কিঞ্চিৎ শক্তি ও সান্ত্বনা পাইবে। অন্যথা অসুখ, অশান্তি ও ক্ষুধার জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে তোমার হৃদয়হীন নিষ্ঠুর দুর্ব্ব্যবহারের জ্বালা তাহার প্রাণে যে ক্ষত সৃষ্টি করিবে, তাহাই হয় তো শেষে প্রাণ-ঘাতী হইয়া উঠিবে। সুতরাং কাহারও উপকার করিতে না পারিলেও

অপকার করিও না, সাহায্য করিতে না পারিলেও ক্ষতি করিও না, প্রাণরক্ষা করিতে না পারিলেও প্রাণহানির কারণ ঘটাইও না। মনে রাখিও, মানুষ ভুলিয়া গেলেও প্রকৃতি কিছু ভুলে না, সে তোমার দুর্ব্ব্যবহার ও দুষ্কৃতির উপযুক্ত প্রতিশোধ ঠিক সময়ে যথাযোগ্যভাবেই গ্রহণ করিবে।

—:০:—

সহায়তা

জীবনের সুদীর্ঘ গন্তব্য-পথে কত পর আপন হয়, আবার কত আপনার জন পর হইয়া যায়। কত অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তি মুহূর্ত্তের পরিচয়ে সাহায্য করিবার জন্য অন্তরঙ্গ সুহৃদের মত কোমর বাঁধিয়া পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, আবার কত অন্তরঙ্গ সুহৃদ ভীষণ দুঃসময়ে কঠোর বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিয়া নিতান্ত পরের মত নিঃশব্দে দূরে সরিয়া যায়। এ জগতে যাহার সাহায্য সহানুভূতি যত বেশী প্রয়োজন ও যত বেশী নিশ্চিত, তাহার সাহায্য সহানুভূতি হইতেই প্রয়োজনকালে তত বেশী বঞ্চিত হইতে হয়, আর যাহার নিকট হইতে কখনও কোন কিছু আশা করা যায় না, তাহার নিকট হইতেই অপ্রত্যাশিত ভাবে অপর্য্যাপ্ত সাহায্য আসিয়া পৌঁছায়। তাই আদর্শের সাধনায় নিয়োজিত জীবন-পথের সত্যিকার পথিক যে, সে কখনও প্রিয়-সমাগমে (আশায়) উৎফুল্ল বা প্রিয়াপসরণে (নিরাশায়) মুহ্যমান হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে না। সে সমস্ত অবস্থাকেই ভগবদভীপ্সিত মনে করিয়া মনঃপ্রাণকে

তন্মুখী রাখিয়া আপনার ভাবে আপনি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া পথ চলিতে থাকে। কেহ সাহায্যার্থ কাছে আগাইয়া আসুক অথবা বীতশ্রদ্ধ হইয়া দূরে সরিয়া যাউক—কিছুতেই সে ভ্রূক্ষেপ করে না। কারণ, সে সর্ব্বদা জানে যে, জীবনের মহান্ লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে তাহার চেষ্টা-যত্ন-সাধনা তাহাকেই করিতে হইবে, অন্য কেহ আসিয়া কিছু করিয়া দিবে না (দিতে পারেও না)। সুতরাং অন্য কাহারও উপর নির্ভর না করিয়া কে আগাইয়া আসিল অথবা কে পিছাইয়া গেল সে-দিকে না তাকাইয়া, আত্মশক্তিতে শক্তিমান হইয়া বীরের মত সে স্বীয় লক্ষ্য-পথে ছুটিয়া চলে। আর ইহাই বীর সাধকের চলার ভঙ্গী।

এ জগতে শ্রীভগবানই সাধকের পরম সহায়, জীবন-পথের একমাত্র নির্দ্দেষ্টা ও পরিচালক। সুখে দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, রোগে-স্বাস্থ্যে—জীবনের সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থায় তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর, প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হও, দেখিবে—তিনি তোমার কণ্টকাকীর্ণ পথ কুসুমাস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, সমস্ত বিপদাপদের মধ্যে স্নেহময়ী জননীর মত সর্ব্বদা কোলে করিয়া তিনি তোমাকে রক্ষা করিতেছেন।

-:০:—

সুখানুসন্ধান

সুখ কৈ, শান্তি কৈ, আনন্দ কৈ? জন্মজন্মান্তরের তৃষিত বুভুক্ষিত মানবাত্মা জন্মজন্মান্তর ধরিয়া মর্ম্মভাঙ্গা করুণ সুরে আর্ত্তনাদ করিয়া ফিরিতেছে—

"নাই কিরে সুখ, নাই কিরে সুখ
এ ধরা কি শুধু বিষাদময়?
যাতনে জ্বলিয়া কাঁদিয়া মরিতে
শুধুই কি নর জনম লয়?"

এই হাহাকার, এই আর্ত্তনাদ শুধু আজিকার নয়, ইহা নিত্যকার—চিরন্তন। যুগ-যুগান্তর, জন্মজন্মান্তর ধরিয়া মানুষ প্রতিনিয়ত অসহ্য জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া সুখের সন্ধানে কত বিনিদ্র রজনী, কত বিরামহীন দিবস কাটাইয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন শান্তির চেষ্টায় নিদাঘ-মধ্যাহ্নের কত প্রচণ্ড তাপ, শীত নিশীথের কত দুরন্ত হিমানী, ঘন বর্ষার কত প্রবল বারিধারা সে মস্তকে ধারণ করিয়াছে; কত উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গ উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, কত দুস্তর সমুদ্র পাড়ি দিয়াছে, কত ঊষর মরু-প্রান্তর অতিক্রম করিয়া সে প্রতিনিয়ত সুখের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে; কিন্তু কৈ, তবুও তাহা মিলিল কোথায়? বিপুল বৈভব, অটুট স্বাস্থ্য, অগাধ বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্য, কত ধন-জন-পরিবার, মান-যশ-প্রতিপত্তি লাভ হইল, কিন্তু তথাপি প্রকৃত শান্তি, সত্যিকার আনন্দ লাভ হইল কোথায়? দুই দিন যাইতে না যাইতে প্রাপ্ত বিষয়ের মনোরমত্ব ঘুচিয়া যায়, মহাকালের নির্ম্মম আঘাতে মানুষের বড় সাধের আশা আকাঙ্ক্ষা মুহূর্ত্তে

ভাঙ্গিয়া চুরমার হয়, মানুষ যাহা কিছুকে আনন্দের উপাদানরূপে আক্‌ড়াইয়া ধরে, ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে তাহাই নিঃশেষে ধ্বংস হইয়া যায়, আর প্রতিক্রিয়ায় অশান্তির আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। দেহবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাম সহায়ে যতই সুখের আশায় বিষয়ের পানে আগাইয়া যায়, ততই সুখ আলেয়ার আলোর মত দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইয়া মরুমরীচিকার মত কুহকজাল সৃষ্টি করিয়া কেবলই দূরে সরিয়া যায়; লাভ হয় শুধু শ্রান্তি, ক্লান্তি, বিষাদ, অবসাদ, দুঃখ, দৈন্য, অশান্তি, হাহাকার।

হা মানব! ভ্রান্ত তুমি। শান্তির আশায় বৃথাই তুমি বাহিরে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছ। কিন্তু প্রকৃত শান্তি, সত্যিকার আনন্দ বাহিরে নয় ভিতরে, তোমার অন্তরে—তোমার নিজের কাছে। কস্তুরী-গন্ধে আত্মহারা হরিণ যেমন কোথা হইতে গন্ধ আসিতেছে বুঝিতে না পারিয়া দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করে, তুমিও তেমনি স্বীয় অন্তরস্থিত আনন্দ-উৎসের সন্ধান না জানিয়া শান্তির আশায় দিশাহারা হইয়া সমস্ত জগৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছ! একবার বহির্মুখী মনকে জাগতিক বিষয় হইতে ফিরাইয়া অন্তর্মুখী কর, হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ কর, দেখিবে—চিরশান্তির অক্ষয় উৎস সেখানে লুক্কায়িত রহিয়াছে!

আত্মন্! সুন্দর আকাশের গাঢ় নীলিমা যেমন মিথ্যা ও ভ্রান্তি তেমনি বিষয়ে যে সুখ বা আনন্দ বোধ হয়, তাহাও মিথ্যা, ভ্রান্তি। সূর্য্যের কিরণ চন্দ্রের উপর বিচ্ছুরিত হওয়ায় যেমন চন্দ্রকে আলোক-সম্পন্ন বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলোক নাই, তেমনি আনন্দস্বরূপ আত্মার আনন্দধারা বিষয়ের উপর বিচ্ছুরিত

হওয়ায়ই বিষয়কে আনন্দময় বলিয়া মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে বিষয়ের কোন আনন্দসত্তা নাই। বিষয়ে যদি প্রকৃতই সুখ থাকিত, তবে আজ যাহার প্রাপ্তিতে তুমি সুখ পাইতেছ বলিয়া মনে করিতেছ, কালই তাহাতে অসুখী হইতেছ কেন? আজ যাহার অভাবে তুমি দুঃখানুভব করিতেছ, কাল তাহার প্রাপ্তিতে তুমি সুখী হইতে পারিতেছ না কি জন্য? আজ যাহা লাভের জন্য অধীর অস্থির হইয়া উঠিতেছ, দুই দিন পরে আর তাহার জন্য কেন তেমন অনুরাগ থাকে না? মনের এক প্রকার অবস্থায় যাহা তোমাকে শান্তি দান করিতেছে, ঘণ্টা দুই পরেই মনের অন্যরূপ অবস্থায় কিজন্য তাহাতে তোমার অন্তরে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠে? বিষয় তো একই রহিয়াছে, তবে এই ভাবান্তর কেন? তিক্ত জিনিষ যেমন সব সময়েই তিক্ত লাগে, তেমনি বিষয়ে যদি আনন্দ থাকিত তবে সব সময়েই তাহাতে আনন্দ পাওয়া যাইত। কিন্তু তাহা যখন হইতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে সত্যই মানুষকে প্রকৃত সুখ, শান্তি, আনন্দ দিবার কোন ক্ষমতা বিষয়ের নাই।

সুখ-দুঃখ মানুষের নিজের সৃষ্টি। কেহ দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও নিদ্রার অভাবে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, আর কেহ মৃত্তিকাশয্যায় বাহুমাত্র উপাধানে শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে; কেহ দিনান্তে শাকান্ন ভোজনে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছে, আবার কেহ চর্ব্বচুষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি বিবিধ রকমের বহু উপাদেয় আহার্য্য গ্রহণ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছে না। কেহ মহার্ঘ বসন ভূষণে অস্বস্তি বোধ করিতেছে, কি ভাবে ঘরের বাহির হইবে ঠিক করিতে পারিতেছে না, আবার কেহ জীর্ণবাস পরিধান করিয়াও নির্ব্বিকার চিত্তে পরম গৌরবের সহিত মহামান্য সম্রাটের সুরম্য প্রাসাদ

ও শ্রেষ্ঠ মনীষিসমাজ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেছে। মানুষের এই যে তৃপ্তি অতৃপ্তি, শান্তি-অশান্তি ইহা শুধু তাহার নিজের ভাব, আদর্শ ও মনোবৃত্তির উপর নির্ভর করিতেছে।

সমুদ্রবক্ষে অনন্ত লহরীর মত মানুষের অন্তরে প্রতিনিয়ত সুখ-লাভের অনন্ত কল্পনা, অফুরন্ত কামনা-বাসনা উঠিতেছে, ভাসিতেছে, বিলীন হইতেছে। সুখপিয়াসী বৈষয়িক মানুষ এই কল্পনার রঙ্গীন রথে চড়িয়া কামনানুরূপ বিষয়ের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যখন স্বীয় আকাঙ্ক্ষিত বাসনানুরূপ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটিতেছে, তখনই কিঞ্চিৎ কৃত্রিম সুখ অনুভব হইতেছে, আর যখনই তাহার সহিত বিচ্ছেদ ঘটিতেছে বা অভীপ্সিত বিষয় লাভে অকৃতকার্য্য হইতেছে তখনই আসিতেছে ঘোর অসুখ অশান্তি। এমনিভাবে ঐন্দ্রিয়ক-সুখলব্ধ মানুষ সংসার-সমুদ্রে কামনা-বাসনার প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইতেছে, কিন্তু তবুও তাহার চেতনা জাগে কই? প্রকৃত সুখ—ইন্দ্রিয়াতীত পরম বস্তু লাভে যত্নবান হয় কই?

জীবন-পথের সাধক! তুমি যদি প্রকৃত শান্তিপিয়াসী হও, তবে প্রথমে দৈনন্দিন জীবনে তোমার ইচ্ছার অনুকূল ও প্রতিকূল যাহা কিছু তোমার নিকট উপস্থিত হইবে, তাহাকেই তুমি ভগবানের দান বলিয়া গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হও। এইভাবে প্রতিনিয়ত সমস্ত কিছুকে ভগবানের দান বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইলে, যাহা কিছু তোমার অনাকাঙ্খিত, অতৃপ্তিকর বা অশান্তি-জনক, তাহা আর তোমাকে অশান্তি দিতে পারিবে না, পরন্তু সেইটিকেই তুমি স্বেচ্ছায়

বরণ করিয়া লইলে তাহা তোমার শান্তিরই কারণ হইবে।* তারপরে তুমি সমস্ত মনঃপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে জাগতিক বিষয় হইতে আহরণ করিয়া অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে—আনন্দময় কোষে পরমানন্দের সন্ধান কর। না—না, ঊর্দ্ধে, আরও ঊর্দ্ধে, ইন্দ্রিয়-জগতের পরপারে, কোষাতীত—দ্বন্দ্বশোকমোহাতীত সেই পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মার সন্ধানে অগ্রসর হও।

"তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো
বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ"

আত্মাই একমাত্র অমৃত স্বরূপ। সুতরাং অন্য সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহাকেই জান, অবগত হও। তাঁহার চিন্তায় সমস্ত মনঃপ্রাণ ডুবিয়া গেলে দেখিবে—চিরশান্তি-রাজ্যের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে, এই তুচ্ছ শোকদুঃখপূর্ণ মরজগৎ স্বর্গের নন্দনকাননে পরিণত হইয়াছে, কোথাও দুঃখ-দৈন্য, অসুখ-অশান্তি, হাহাকার নাই, নাই কোন ভয়-শোক-মোহ, দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা, অভাব-অনটন; সেখানে কেবল শান্তি, শান্তি, আনন্দ আনন্দ—চির অফুরন্ত মহানন্দের সুবিশাল পারাবার। সেই আনন্দ-পারাবারে জীবসমূহ জন্মিতেছে, মহানন্দে

*মানুষের অশান্তি আসে দুই কারণে। প্রথমতঃ যে যাহা চায় তাহা যখন সে না পায়; দ্বিতীয়তঃ যাহা সে না চায় বা পছন্দ না করে তাহা যখন (তাহার) ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হয়। এমতাবস্থায় অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তির জন্য কোন আকাঙ্খা না করিলে এবং যাহা কিছু অযাচিত ভাবে, (স্বাভাবিক ভাবে) আসিবে তাহাকে সানন্দে ভগবানের দান বলিয়া বরণ করিয়া লইলে জাগতিক বিষয়ের লাভ-অলাভ হইতে আর কখনও অশান্তি আসিতে পারিবে না।

হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে, আবার তাহাতেই সানন্দে বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে।

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন
জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

আদি, মধ্য, অন্ত—সর্ব্বত্রই কেবল আনন্দ, কোথাও ইহার ছেদ নাই, বিরাম নাই, পরিসমাপ্তি নাই। এই আনন্দ-স্বরূপকে অবগত হইতে পারিলে আর কোন ভাবনা থাকে না, জরা-ব্যাধি-শোক-মোহগ্রস্ত নরমানুষ মহানন্দময় চির অমরত্ব লাভ করিয়া নির্ভয় হয়।

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন।"

তৃষিত, তাপিত, শান্তি-পিয়াসী চিরবুভুক্ষিত মানব! এস, এস। সংসারের জ্বালামালা জুড়াইতে হইলে, বিষয়-তাপদগ্ধ হৃদয়ের অশান্তি দাবানল চিরতরে নির্ব্বাপিত করিতে হইলে এস, এই আনন্দস্বরূপ মহানন্দ-সাগরে অবগাহন কর। সমস্ত শোকতাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে; তোমার জীবন ধন্য ও কৃতার্থ হইবে। ওঁ শম্

জানা, বুঝা, কথা ও কাজ

মানুষ জানে অনেক; কিন্তু করে—করিতে পারে খুব কম।

মানুষের জানা ও বুঝা তখনই সার্থক হয়, যখন সে তাহা তাহার দৈনন্দিন জীবনে কর্ম্ম ও সাধনার ভিতর দিয়া রূপায়িত করিয়া তোলে; অন্যথায় উহা শুধু নিরর্থক নয়, জগতের আবর্জ্জনাস্তূপের মতই

বিরক্তিকর, পীড়াদায়ক। সুতরাং যতটুকু সম্ভব, তুমি তোমার 'জানা ও 'বুঝাকে' বাস্তব" রূপ দানে সচেষ্ট হও—একটা কিছু গড়িয়া তোল, করিয়া দেখাও। তাহা হইলে তোমার কল্যাণ হইবে, সঙ্গে সঙ্গে অপরেরও কিছু উপকার হইবে।

* * *

মানুষ শুধু কথা চায় না, চায় কাজ; শুধু জানিতে চায় না, চায় দেখিতে। ঝুরি ঝুরি কথা শুনান অপেক্ষা যদি কণামাত্রও করিয়া দেখাইতে পার, তাহা হইলে তাহাই সহস্র গুণ শক্তিশালী হইয়া লোকের মনের উপর অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিবে—তোমার চেষ্টা, শ্রম ও সাধনা সার্থক ও কার্য্যকরী হইবে। অন্যথা নিরর্থক বাগাড়ম্বর করিয়া বিশেষ কোন ফল হইবে না।

* * *

এ জগতে জড় নিশ্চেষ্ট যে, সে-ও নৈষ্কর্ম্য ও নিশ্চেষ্টতাকে ঘৃণা করে, নিতান্ত অলস অকর্ম্মণ্য যে সে-ও উৎসাহ, উদ্যম ও কর্ম্মপ্রবণতাকে অন্তরে অন্তরে ভালবাসে। সামান্য একটা বালকও শূন্যগর্ভ আস্ফালন বা নিরর্থক বাক্যবিন্যাসে ভোলে না, অন্য পরে কা কথা।

* * *

পৃথিবীতে যাহারা কম কথা বলে ও বেশী কাজ করে এক মাত্র তাহারাই তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হয় এবং অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। নির্ব্বাক নীরব কর্ম্ম ও গভীর চিন্তাপ্রবাহ ধীর অথচ সুনিশ্চিতরূপে মানুষকে প্রকৃত শক্তিশালী ও প্রতিভাসম্পন্ন করিয়া সমাজ ও জাতীয় জীবনকে গড়িয়া তোলে। মহান্ আদর্শসমূহই ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবনে মূর্ত্ত হইয়া ওঠে কর্ম্ম, অনুষ্ঠান ও আচরণের ভিতর দিয়া। যদি নিজের ও জগতের সত্যাই কিছু

উপকার করিতে চাও, যদি সমগ্র জাতি ও সমাজকে তোমার ভাব ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতে ইচ্ছা কর, তবে নিরর্থক কথা ছাড়িয়া কাজ আরম্ভ কর, অপরকে যাহা করিতে বলিবে, তাহা নিজে করিয়া দেখাও ; কেন না, মানুষ কানে শোনার চেয়ে চোখে দেখিয়া বেশী অনুপ্রাণিত হয়, উপদেশের চেয়ে আদর্শ দেখিয়া সহজে বুঝিতে ও শিখিতে পারে।

* * *

মানুষ প্রকৃত মহান্ ও শ্রেষ্ঠ হয় মহৎ কাজ, অনুষ্ঠান, আচরণ ও অনুভূতির দ্বারা – শুধু জানা, বুঝা বা কথার দ্বারা নয়। (কেননা, চরিত্রহীন লম্পটও অনেক ভাল ভাল বিষয় জানিতে এবং অপরিণত বয়স্ক বালকও অনেক বড় বড় কথা বলিতে বা আবৃত্তি করিতে পারে)। যে ব্যক্তি যত বেশী মহদনুষ্ঠানপরায়ণ ও অনুভূতিসম্পন্ন, সেই ব্যক্তিই তত বেশী শক্তিমান ও প্রভাবশালী এবং তাঁহার বাক্যাবলীই মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্যকরী হয়। সুতরাং যদি কথা বলিতেই হয়, তবে প্রথমে মহান্ আদর্শকে জীবনে বিকশিত কর, তারপর কঠোর সাধনার দ্বারা দিব্য অনুভূতি লাভ করিয়া তোমার জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির বাণী সকলকে শুনাও। প্রথমে প্রকৃত মানুষ হও, কথা বলিবার সত্যিকার যোগ্যতা ও অধিকার লাভ কর, তারপর কথা বলিতে আরম্ভ কর। তখন তোমার প্রত্যেকটি কথা বজ্রের মত অব্যর্থ, বিদ্যুতের মত শক্তিশালী ও মন্ত্রের মত কার্য্যকরী হইবে। তখন তোমার একটি মাত্র কথা শুনিবার জন্য সমগ্র দেশ ও জাতি উৎকর্ণ হইয়া থাকিবে, একটিমাত্র কথা শুনিয়া সহস্র সহস্র নরনারী তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সিন্ধু-বক্ষের মত উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে, তোমার মহান্ ব্যক্তিত্বের চৌম্বক আকর্ষণে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ তোমার

অনুসরণ করিবে, সমগ্র জগতে এক অদ্ভুত ভাবপ্রবাহ, একটা বিস্ময়কর আলোড়ন সৃষ্টি হইবে। তখন—কেবলমাত্র তখনই তোমার কথা বলা সার্থক হইবে।

——::——
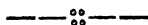
কর্ত্তব্য নির্ণয়

বিপদে যার বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয় না, দুঃসময়ে, বিষম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যে প্রকৃত কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া অবিচলিতচিত্তে তাহা সম্পাদন করিতে অগ্রসর হয়, সে-ই নরোত্তম, সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। আর যে ব্যক্তি বুদ্ধির দোষে মোহবিভ্রান্ত হইয়া অকর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য ও কর্ত্তব্যকে অকর্ত্তব্য মনে করিয়া অকার্য্য ও দুষ্কার্য্য করিতে থাকে, সে নরাধম, সকলের ঘৃণা ও কৃপার পাত্র।

দিগন্তহীন বিশাল বারিধিবক্ষে দিঙ্‌নির্ণয়ের জন্য যেমন উত্তম দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র আবশ্যক, তেমনি জীবনের এই সুবিশাল কর্ম্মক্ষেত্রেও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য নির্ম্মল বিবেক-বুদ্ধির প্রয়োজন। যন্ত্র ঠিক না থাকিলে উপযুক্ত অভিজ্ঞ নাবিকও যেমন দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া বিরাট পোতকে বানচাল করিয়া দেয়, তেমনি বুদ্ধি মলিন হইলে অতি বড় প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া জীবনকে ধ্বংস করিয়া ফেলে।

জীবনে যদি প্রকৃতই কৃতী হইতে চাও, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষময় এই জীবন-পথে ঠিক ঠিক কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া যদি যথার্থই লক্ষ্যে উপনীত হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে জগৎপিতার শ্রীচরণে

নির্ম্মল বুদ্ধি ও মহৎ অন্তঃকরণ লাভের জন্য ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা কর। কুচিন্তা, কুভাবনা ও উদ্দাম বিষয়ভোগাকাঙ্ক্ষা—যাহা চিত্তকে মলিন ও বুদ্ধিকে বিকৃত ও বিভ্রান্ত করিয়া দেয়, তাহা সযত্নে পরিহার কর। এ জগতে সমস্তই ক্ষণস্থায়ী, চঞ্চল, মলিন, আর একমাত্র ভগবানই নিত্য, স্থির, নিষ্কল, নির্ম্মল। সুতরাং চিত্ত যতই ভগবচ্চিন্তায় নিবিষ্ট হইবে, বুদ্ধি যতই ভগবানকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে ততই তাহা বিষয়মালিন্যশূন্য হইয়া নির্ম্মল ও সুস্থির হইবে এবং রাজহংসের জল-মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ দুগ্ধ গ্রহণের ন্যায় তুমিও মিশ্রিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য হইতে অকর্ত্তব্য পরিহার পূর্ব্বক যথার্থ কর্ত্তব্য নির্ণয় ও গ্রহণ করিয়া জীবনকে সার্থক করিতে সমর্থ হইবে।

আত্মপ্রশংসাই প্রকৃত আত্মহত্যা

স্বেচ্ছায় দেহের ধ্বংস সাধন করিয়া জীবন নষ্ট করাই প্রকৃত আত্মহত্যা নয়, প্রকৃত আত্মহত্যা হইতেছে আত্মপ্রশংসা, স্বয়ং আপনার গুণ কীর্ত্তন করা। মানুষ যখন দুর্ব্বুদ্ধিবশে স্বেচ্ছায় আপনার পর্ব্বত-প্রমাণ ভুলত্রুটি ও দোষের প্রতি উদাসীন থাকিয়া সরিষাপ্রমাণ গুণকে তালপ্রমাণ করিয়া মিথ্যা আত্মপ্রশংসায় মুখর হইয়া উঠে, তখনই তার অন্তর কলুষিত হইয়া তাহার সত্যিকারে অপমৃত্যু ঘটায়।

কঠোর সংগ্রাম-সহকারে সমস্ত প্রতিকূলতাকে পরাভূত করিয়া লক্ষ্যের পথে অপ্রতিহত গতিতে দ্রুত অগ্রসর হওয়াই প্রকৃত জীবন। আত্মকল্যাণকামী মানুষ স্বভাবের দোষত্রুটি-গলদসমূহ দূর ও অনায়ত্ত

গুণরাশির আয়ত্তদ্বারা অপূর্ণ জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া মৃত্যু—জীবনের ছেদ, বিরতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়, তার মিথ্যা আত্মপ্রশংসাপরায়ণ ব্যক্তি জীবনের দূষিত ক্ষতরূপ দোষত্রুটি গলদগুলিকে ঢাকিয়া রাখিয়া জীবনের অপূর্ণতা সম্বন্ধে উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট থাকিয়া স্বীয় উন্নতি ও অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়া ধ্বংস—মহামৃত্যুকে বরণ করিয়া লয়। আত্মপ্রশংসাপরায়ণ ব্যক্তির দৃষ্টি বা চেষ্টা আত্মশোধন বা আত্মোন্নতির দিকে নয়, তাহার দৃষ্টি, তাহার সমস্ত চেষ্টাযত্ন-উদ্যোগ শুধু গলদ ঢাকা দিয়া নিজেকে অপরের নিকট বড় করিয়া জাহির করিবার দিকে। এই মিথ্যাভণ্ডামি ও আত্মপ্রতারণাই দূষিত ক্ষতের ন্যায় পারিপার্শ্বিক সকলকে পূতিগন্ধে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে এবং নিজেকেও ধ্বংসের মুখে টানিয়া লইয়া যায়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালনার্থ* আত্মহত্যায় উদ্যত অর্জ্জুনকে আত্মবিনাশে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বলিয়াছেন: "দেহের ধ্বংস-সাধনাই আত্মহত্যা নয়, প্রকৃত আত্মহত্যা হইতেছে আত্মপ্রশংসা; তুমি আত্মপ্রশংসা করিয়া আত্ম-হত্যার প্রতিজ্ঞা পূরণ কর।"

---

*গাণ্ডীবী অর্জ্জুন এক সময় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন: যে তাহাকে গাণ্ডীব ত্যাগ করিতে বলিবে তাহাকে তিনি হত্যা করিবেন, না পারিলে নিজে আত্মহত্যা করিবেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধর্মরাজ একদিন কর্ণের সহিত যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করিয়া শিবিরে আসিলে, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন তাঁহার সন্ধান করিতে করিতে শিবিরে আসেন। তখন যুধিষ্ঠির কর্ণের নিধন না হওয়ার সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনকে তিরস্কার করিয়া গাণ্ডীব ত্যাগ করিতে বলিলে অর্জ্জুন তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হন এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আত্মবিনাশে প্রবৃত্ত হন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে পুনরায় বাধা প্রদান করিয়া বলেন, আত্ম-প্রশংসাই প্রকৃত আত্মহত্যা। সুতরাং তুমি আত্মপ্রশংসা করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন কর।

মহাশক্তি সাধনের অগ্রদূত, জাতীয় কল্যাণব্রতে ব্রতী জীবন-মন্ত্র প্রচারের চারণদল—সাধকবৃন্দ! সাবধান, তোমাদের সাধনার পবিত্র বেদীতে আত্মপ্রশংসা তথা আত্মবিনাশের কলঙ্ক-স্পর্শে মলিন করিও না। মুষলই যেমন যদুকুল ধ্বংসের একমাত্র কারণ হইয়াছিল, তেমনি মিথ্যা আত্মপ্রশংসা, আত্মপ্রচার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার উদগ্র, নির্লজ্জ আকাঙ্ক্ষাই সঙ্ঘ-সংহতি ধ্বংসের একমাত্র কারণ। ইহাতে শুধু ব্যক্তিগত জীবনেরই ধ্বংস হয় না, এই ধ্বংস-বীজরূপ মহাপাপ ভেদবিবাদ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়া সমাজ, জাতি বা সঙ্ঘের সংহতি-জীবনকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়! সুতরাং যখনই আত্মপ্রশংসার ইচ্ছা হইবে, আত্মপ্রচার ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিবে, তখনই বিচার করিয়া দেখিবে যে, সত্যই তোমার ভিতর প্রশংসা লাভের মত কিছু আছে কিনা। প্রশংসা লাভের মত যতটুকু গুণ আছে, তাহার তুলনায় নিন্দার যোগ্য ক্রটিবিচ্যুতি ও দোষ কতখানি। এ জগতে যাঁহারা কৃতী ও মহান্ হইয়া সত্যই সকলের প্রশংসা ও পূজা প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন, তাঁহাদের তুলনায় তোমার ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্ব কতটুকু? তাঁহারা যত অল্প বয়সে, যত অল্প সময়ে যতখানি শক্তিসামর্থ্য ও শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিয়াছেন, সেই তুলনায় তুমি কতটুকু শক্তিসামর্থ্য ও শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিয়াছ বা দিতেছ? জীবন-সাধনায় তাঁহাদের কৃতিত্বের তুলনায় তোমার কৃতিত্বের পরিমাণ কত? এইভাবে আত্ম-সন্ধানী দৃষ্টি লইয়া নিজেকে যতই নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবে, ততই নিজের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি হইয়া আত্মপ্রশংসা ও আত্মপ্রচারের মোহ কাটিয়া যাইবে। যতই উন্নত ও মহান্ ব্যক্তিদের দিকে তাকাইবে, মহাপুরুষদের সহিত যতই নিজের জীবনের পরিমাপ

করিয়া দেখিবে, মোট কথা, দৃষ্টিকে যতই ঊর্দ্ধমুখী করিয়া রাখিতে পারিবে, জীবন-পথে ততই ক্রমোন্নতি অব্যাহত থাকিবে, অন্যথা অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়া চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

—:০:—

আপোষ রফা

অন্যায় বা পাপের সহিত কখনও আপোষ রফা করিও না। ইহার চেয়ে বড় অপরাধ আর নাই।

দূষিত ক্ষতকে ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া ঢাকিয়া রাখিলে তাহা যেমন ক্রমশঃ বিষাক্ত হইয়া জীবন নাশের উপক্রম করে, তেমনি অন্যায় বা পাপকেও সংশোধন না করিয়া প্রশ্রয় দিয়া চলিলে ক্রমে উহা মানুষের মনুষ্যত্ব, এমন কি জীবনীশক্তি পর্য্যন্ত ধ্বংস করিতে উদ্যত হয়। সুতরাং যে পর্য্যন্ত না জীবন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক হইয়া উঠে, যে পর্য্যন্ত না স্বভাবের দোষ-ত্রুটি-গলদগুলি সমূলে উন্মূলিত হইয়া সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেই পর্য্যন্ত উহার বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে আপোষহীন নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাও। সামান্য পাপকেও রেহাই দিও না, সাধারণ ত্রুটি বা অবহেলাকেও ক্ষমা করিও না ; কারণ, উহা সামান্য বা সাধারণ হইলেও একদিন বিরাট আকার ধারণ করিয়া ক্রূর সর্পের মত তোমায় দংশন করিবে।

বীর সৈনিকের মত মহান্ লক্ষ্য-সাধনায় নিয়োজিত বীর সাধকেরও পাপের সহিত সংগ্রামই একমাত্র জীবন-ব্রত— সাধনা, তপস্যা। রণক্লান্ত বীর সৈনিক যেমন হাসিতে হাসিতে জীবন বিসর্জ্জন দেয়, কিন্তু তবুও

শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ বা পরাভব স্বীকার করে না, তেমনি আত্ম-মর্য্যাদাসম্পন্ন বীর সাধকও কঠোরতম বিপদকে বরণ করিয়া লয়, তথাপি দুর্ব্বলতার সহিত আপোষ-রফা করিয়া নতজানু হয় না।

জীবনের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে আপোষ-রফার কোন স্থান নাই, উহা কাপুরুষতারই নামান্তর—মহাপাপ। এ জগতে সংগ্রামভীরু, কাপুরুষ যে, সে চিরঘৃণ্য; সামান্য বালকও তাহাকে উপহাস করে, অবলা নারীও ঘৃণায় তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। সুতরাং বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ; কেননা, তাহাতে কাহারও মনে কোন প্রকার গ্লানি না জন্মাইয়া কাপুরুষতার কলুষ-কালিমা জগতের বুক হইতে চিরতরে মুছিয়া যায়।

বিপদকে এড়াইয়া দূরে গেলেই বিপদ দূরে যায় না, বরং দ্রুত নিকটে আগাইয়া আসে; শত্রু বা আততায়ীর ভয়ে ভীত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেই রেহাই পাওয়া যায় না, তাহাতে বরং শত্রু প্রশ্রয় পাইয়া ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত নিঃশেষে শুষিয়া লয়। তাই জীবন-পথের প্রকৃত পথিক শত্রুর সম্মুখে বীরের মত বুক টান করিয়া দাঁড়ায়, তাল ঠুকিয়া শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালায়। তাহাতে যদি মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে সে হাসিমুখে গ্রহণ করে; কিন্তু তথাপি পাপের সহিত আপোষ-রফা করে না, ন্যায় ও ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়া অন্যায় ও অধর্ম্মকে বরণ করিয়া লয় না। 'পাপ বা দুর্ব্বলতা আসাই দোষের নয়, ইহার সহিত সংগ্রাম না করিয়া আপোষ করা, ইহাকে প্রশ্রয় দেওয়াই প্রকৃত দোষের"—শ্রীশ্রীসঙ্ঘ-নেতার এই মহাবাণী সে অনুসরণ করিয়া চলে।

কঠোর তপোমগ্ন মহাদেবের ললাটাগ্নিতে একদিন মদন ভস্মীভূত

হইয়াছিল, আকুমার ব্রহ্মচারী ভীষ্মের বীরত্বপ্রভাবে পরশুরামের প্রবল পরাক্রম স্তব্ধ হইয়াছিল, কৃচ্ছ্রসাধনপরায়ণ তথাগত বুদ্ধের সঙ্কল্প-হুঙ্কারে মার পরাস্ত হইয়া সিদ্ধির বিজয়মাল্য গলায় পড়াইয়া দিয়াছিল। এই বীরত্বই মানুষের কাম্য, সাধকের চির-আকাঙ্ক্ষিত। এই বীরব্রতই জীবন-সাধনার সাধকের জীবন-ধর্ম্ম—তপস্যা। বাঁচিতে হইলে এইরূপ বীরব্রত উদ্‌যাপন করিয়া প্রকৃত মানুষের মত বাঁচিতে হইবে, অন্যথা আত্মবিলোপ অবশ্যম্ভাবী।

—:O:—

প্রিয় ও অপ্রিয় কথা

এ জগতে অহিতকর হইলেও প্রিয় কথা শুনিবার মত দুর্ব্বলচেতা লোক অনেক; কিন্তু হিতকর হইলেও অপ্রিয় কথা শুনিবার ও শুনাইবার মত বলিষ্ঠ মনোবৃত্তি-সম্পন্ন লোক খুব কম। নিজ নিজ স্বার্থ বা মতলব-সিদ্ধির জন্য অনেকেই প্রবল ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদিগকে অহিতকর মনোরঞ্জনকারী কথা শুনাইয়া প্রিয় হইতে প্রয়াস পায়, কিন্তু স্বার্থহানি বা অপ্রিয় হইবার ভয়ে কেহ তাহাদিগকে হিতকর অপ্রিয় কথা শুনাইতে রাজী হয় না।

পৃথিবীতে প্রকৃত বন্ধু, প্রকৃত হিতৈষী সে-ই, যে প্রিয়াপ্রিয় সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি কোন কিছু গ্রাহ্য না করিয়া উত্তম বৈদ্যের মত সর্ব্বদা প্রকৃত হিতকর কথা বলে, আর প্রকৃত বীর সেই ব্যক্তি, যে নিতান্ত তিক্ত, বিরক্তিকর হইলেও হিতকর কথা ধীরভাবে শোনে এবং প্রসন্নচিত্তে

তদনুসারে কার্য্য করিতে উদ্যোগী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থান্বেষী, নীচ তোষামোদকারী চাটুকারের দলকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে।

তোষামোদপ্রিয়তা ও চাটুকারিতা মানুষকে যেরূপ নীচ, হেয় ও অপদার্থ করে এরূপ আর কোন কিছুতেই করিতে পারে না। মানুষের জীবনে ইহা এক চরম বিপর্য্যয়, নিদারুণ অভিশাপ। তোষামোদ করার প্রবৃত্তি ও তোষামোদপ্রিয়তা মানুষের মনুষ্যত্ব, হিতাহিত ন্যায়ান্যায়বোধ ও স্বাধীন মনোবৃত্তি নষ্ট করিয়া মানুষকে একেবারে অমানুষ করিয়া ফেলে। সুতরাং জীবন-সাধনার সাধককে এই বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে।

—:o:—

দায়িত্বের অধিকার

সামান্যমাত্র কার্য্যের ক্ষমতা বা দায়িত্বভার পাইলেই যে ব্যক্তি অভিমানে অন্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হয় এবং অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া ক্ষমতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ঢাকঢোল বাজাইতে ও লোকের উপর নানা প্রকার অত্যাচার উপদ্রব করিতে সুরু করে, তাহার মত কৃপার পাত্র এ জগতে অতি বিরল; মহান্ কর্ত্তব্য ও বিশাল দায়িত্বভার বহনের সে সম্পূর্ণ অযোগ্য। কোরকেই ঝরিয়া পড়িবার মত জীবনের প্রারম্ভেই তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে, বোধনেই বিসর্জ্জনের বাজনা সুরু হইয়া উন্নতি অভ্যুদয়ের পথ চিররুদ্ধ হইয়া যায়।

তরঙ্গবিক্ষুব্ধ অপরিসীম বেগশালী অসংখ্য নদী-প্রবাহ-ধারণকারী প্রশান্ত গম্ভীর সমুদ্রের মত যিনি অপরিসীম ঝড়ঝঞ্ঝাটপূর্ণ গুরুতর

দায়িত্বভার ও ক্ষমতাসমূহ নীরবে, ধীর স্থির অবিচলিতচিত্তে বহন করিতে পারেন, এই জগতে তিনিই প্রকৃত শ্রদ্ধার্হ, জগতের শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য, মহত্তম দায়িত্ব, ক্ষমতা ও নেতৃত্ব তাঁহারই জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে।

মহান্ কর্ত্তব্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া যদি প্রকৃতই ধন্য হইতে চাও, তবে ঔদ্ধত্য ও অভিমান ত্যাগ করিয়া প্রথমে ক্ষুদ্রতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যসমূহ যোগ্যতার সহিত নীরবে উদ্‌যাপন কর, সঙ্গে সঙ্গে নিরহঙ্কার ও নিরভিমান হওয়ার জন্য সাধন করিতে থাক। কখনও যদি তোমার দ্বারা কোনও গৌরবজনক কাজ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে ভাবিও—ভগবান শুধু তাঁহার সেবকের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্যই তোমার ভিতর তাঁহার মহান্ শক্তি সঞ্চার করিয়া স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করাইয়া লইয়াছেন। ইহাতে যদি কিছু কৃতিত্ব থাকে, তবে তাহা সম্পূর্ণই তাঁহার, তোমার নয়। তোমার বিশেষ সৌভাগ্য ও সুকৃতি যে, তিনি অপরের পরিবর্ত্তে তোমাকেই তাঁহার কার্য্য সাধনের যন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে প্রতিদিন প্রতি নিশীথে তাঁহার চরণে প্রার্থনা করিও, যেন তিনি তোমাকে সর্ব্বদা সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার, নিরভিমান করিয়া তাঁহার সেবার অধিকার ও গৌরব দানে কৃতার্থ করেন। তাহা হইলেই তুমি মহান্ দায়িত্ব লাভের প্রকৃত অধিকার লাভ করিবে, ক্ষমতা ও প্রভুত্ব আসিয়া তোমার পদ বন্দনা করিবে, তুমি সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার ও নিরভিমানচিত্তে ভগবানের সেবা করিয়া নিজের এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাতির কল্যাণ সাধন করিয়া ধন্য হইবে। ইহাই শ্রেষ্ঠতম দায়িত্ব লাভের প্রকৃত পন্থা।

—:০:—

নামের কাঙাল

মানুষ অভাবে পড়িয়া অর্থের কাঙাল হয়, দায় ও বিপদুদ্ধারের জন্য সাহায্য-সহানুভূতির কাঙাল হয়; কিন্তু নামের কাঙাল হয় শুধু সখ ও দুর্ব্বুদ্ধিতে পড়িয়া। তাই অভাবগ্রস্তকে হৃদয়বান ব্যক্তিমাত্রই সাহায্য করে, সহানুভূতি দেখায়, আর নামের কাঙালকে বাতুলবোধে কচি শিশুটিও পর্য্যন্ত ঘৃণা ও উপহাস করে।

অর্থ চাহিলে পাওয়া যায়, বিষয় চেষ্টা করিলে মিলে, সাহায্য-সহানুভূতিও প্রয়োজন হইলে একেবারে দুষ্প্রাপ্য হয় না; কিন্তু নামযশ চাহিলেই প্রার্থীকে প্রতারণা করিয়া মরীচিকার মত ক্রমশঃ দূরে—নাগালের বাহিরে চলিয়া যায়।

যে নাম চায় না, সে-ই নাম পায়; যে যথার্থই নামযশকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান করে, তাহার পিছনে পিছনেই নামযশ কুকুরের মত ঘুরিয়া বেড়ায়। সুতরাং প্রার্থীর কাঙালী মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বীরের উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের মনোবৃত্তি গ্রহণ কর, ভিক্ষা ও প্রার্থনা ছাড়িয়া প্রকৃত কাজ আরম্ভ কর, তাহা হইলে তোমার মর্য্যাদা ও পৌরুষ লাঞ্ছিত হইবে না, অথচ তোমার কার্য্যের পুরস্কার রূপে ন্যায্য প্রাপ্য হিসাবেই নামযশ যথাসময় আপনিই আসিয়া তোমার অনুসরণ করিবে।

সম্পূর্ণ নিরাকাঙ্ক্ষ, উদাসীন ও অনাসক্ত যে, তাহার নিকটই জগতের ভোগ-সম্ভার, বিত্তৈশ্বর্য্য, প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি, নামযশ প্রভৃতি সমস্ত কিছু আসিয়া উপস্থিত হয়, আর তাহারই এই সমস্ত গ্রহণ,

রক্ষণ ও ব্যবহারের প্রকৃত যোগ্যতা, শক্তি ও অধিকার জন্মে। কারণ, নির্লিপ্ত ও নিরাকাঙ্ক্ষ যে, সে কোন কিছুর বশীভূত বা দাস হয় না, তাহারই বশীভূত বা দাস হয় সকলে। ভোগপ্রতিষ্ঠা ও নামযশের পিছনে যে ছুটে, সে তো ইহাদের দাস, ক্রীড়াপুত্তলী; ভোগপ্রতিষ্ঠা তাহাকে যেরূপ চালায় সে সেইরূপ চলে, যেরূপ খেলায় সেইরূপ খেলে। তাহার আবার স্বাধীনভাবে চলিবার, ভোগপ্রতিষ্ঠাকে মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার সামর্থ্য কোথায়? ক্রীতদাস যে, সে কি কখনও তাহার মনিবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে, না সাহস পায়?

মানুষের ভিতর যখন প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি অর্জ্জনের লিপ্সা উদগ্র হইয়া উঠে, কাজের পরিবর্ত্তে সস্তা নামযশের আকাঙ্ক্ষা প্রবলতর হইয়া দেখা দেয়, মোটকথা মানুষ যখন নামের জন্য হিতাহিত বিবেচনা-শূন্য হইয়া অতিমাত্রায় পাগল হইয়া পড়ে, তখনই তাহার সদ্বুদ্ধি ও সৎকর্ম্মের শক্তি একেবারে লোপ পায়, সে তখন তাহার মহান্ আদর্শ উদ্দেশ্য ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধি হারাইয়া, ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য ও মর্য্যাদাবোধ বিসর্জ্জন দিয়া অপরের প্রশংসা, মনস্তুষ্টি ও বাহবার জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ন্যায়, অন্যায়, ভাল মন্দের দিকে কোন দৃষ্টি থাকে না, তাহার সমস্ত মনোযোগ তখন অপরের সমর্থন ও প্রশংসা কুড়াইবার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। এই ভাবে সে সর্ব্বদা অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া নিজেকে ক্রমশঃ দুর্ব্বল, অকর্ম্মণ্য ও বিবেককে অপমানিত করিয়া একেবারে অন্তঃসারহীন দেউলিয়া হইয়া পড়ে, অন্ধ স্তাবক ও চাটুকার দলের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া স্বীয় উন্নতি অভ্যুদয়ের শেষ যবনিকা টানিয়া ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের শেষ

সমাধি রচনা করে। সাধক দেশসেবকের জীবনে ইহা এক মস্ত বড় বিপজ্জনক অবস্থা।

জীবন-পথের পথিক, জীবন-সাধনার সাধক! সাবধান। নামযশের ফাঁদে পা দিয়া অকাল মৃত্যুকে বরণ করিও না, শ্রীশ্রীসঙ্ঘ-নেতার মহাবাণী উৎকর্ণ হইয়া শোন—"যশমান প্রতিষ্ঠাকে পদদলিত করিয়া, আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, নিন্দাগ্লানি ও বিরুদ্ধ সমালোচনার অগ্নি-পরীক্ষায় নিজেকে শোধন করিয়া লইয়া জীবনের দুর্গম পথে জয়যাত্রা সুরু কর, অহঙ্কার অভিমানকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া জীব-জগতের মহাকল্যাণের জন্য আপনাকে উৎসর্গ কর, প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণ লাভ করিয়া জীবন জনম ধন্য কর।"

——:০:——

কৰ্ম্মী, কৰ্ম্ম ও প্ৰতিষ্ঠান

কর্তৃত্ব-প্রভুত্বের দম্ভ অহমিকা, আত্ম-প্রাধান্য সংস্থাপনের উদ্ধত মনোবৃত্তি ও আত্মপ্রচারের দুর্ব্বার আকাঙ্খা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই কর্ম্মীদের মধ্যে দেখা দেয় ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ, অনৈক্য পার্থক্য, কলহ মনোমালিন্য। নিজেকে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে না লাগাইয়া কর্ম্মীরা যখন প্রতিষ্ঠানকেই নিজের প্রয়োজনে লাগাইতে উদ্যত হয়, স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, কর্ম্মশক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন পূরণ, উৎসাহ-উদ্যম কর্ম্মপ্রচেষ্টা দ্বারা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও উদ্দেশ্য সাধন না করিয়া কর্ম্মীরা প্রতিষ্ঠানের ঐশ্বর্য্য, প্রতিপত্তি, শক্তি ও সুখ্যাতিকে ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, উদ্দেশ্য ও খেয়াল

চরিতার্থের জন্য নিয়োগ করে, তখনই তাহার পরমায়ু শেষ হইয়া যায়; সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির ঘুণ প্রবেশ করিয়া অত্যল্পকাল মধ্যে বিরাট প্রতিষ্ঠানকে একেবারে অন্তঃসারহীন করিয়া ফেলে এবং জীর্ণ অট্টালিকার মত একটু আঘাতেই উহা ধ্বসিয়া পড়ে।

কিন্তু কর্ম্মী যখন প্রকৃত সেবকের মনোবৃত্তি লইয়া ভগবৎসেবা, দেবসেবার উদ্দেশ্যে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, যখন সে কর্ম্মের দায়িত্ব ও সেবার অধিকার লাভ করিয়াই নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করে এবং সমস্ত ফলাফল ইষ্টে সমর্পণ করিয়া ইষ্টের তুষ্টি ও পুষ্টিকেই নিজের তুষ্টি ও পুষ্টি বলিয়া গ্রহণ ও অনুভব করিতে থাকে, তখনই ঊষর মরুবুকে মরুদ্যানের মত বিবিধ জ্বালামালা, অসুখ অশান্তিপূর্ণ এই জগতের বুকে জনসাধারণের শান্তি, সান্ত্বনা ও কল্যাণের উৎস সরূপ সুমহান্ প্রতিষ্ঠান সমূহ শক্তিশালী হইয়া গড়িয়া উঠে।

কর্ম্মীরাই প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত প্রাণশক্তি, মহদুদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থ নিরলস অভিযানই ইহার জীবন। সেবা ও সাধনা, ত্যাগ ও নিস্পৃহতা, সংযম ও পবিত্রতা দ্বারা কর্ম্মীদের জীবন যতই শুদ্ধ ও মহান্ হইয়া উঠিবে অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সমূহও ততই বিশুদ্ধ, মহান্ ও শক্তিশালী হইবে; ইষ্টসমর্পিতচিত্ত, স্বার্থনিরপেক্ষ, নিরলস কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, অটুট সঙ্কল্প ও কঠোর ব্রতপরায়ণ, গভীর দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও নেতার আদেশ পালনে তৎপর, পরস্পর প্রীতিপরায়ণ, নির্ভীক ও উদ্যমসম্পন্ন কর্ম্মিগণের সুদৃঢ় সংহতিই (তাহা যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন) জগতে অসাধ্য সাধন করিতে পারে—করিয়া থাকে, আর ইহার অভাব যেখানে, সেখানেই (সেই সংহতি যত বড়ই হউক না কেন) শুধু দ্বন্দ্বকোলাহল, বাহ্বাস্ফোট, বাগাড়ম্বর, প্রাণহীন গতানুগতিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ—কাজের কাজ কিছুই নয়।

সাবধান, হুঁসিয়ার। তোমার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ নিদারুণ দুঃখকষ্ট লাঞ্ছনা নির্য্যাতন সহ্য করিয়া কঠোর ত্যাগ তপস্যার ভিতর দিয়া বুকের রক্ত ঢালিয়া আন্তরিক দরদ ও অমানুষিক পরিশ্রম সহকারে যে প্রতিষ্ঠানকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, যাহার বর্ত্তমান মহত্ত্ব, গৌরব, প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির জন্য নীরবে শত সহস্র কর্ম্মীকে বিরাম-বিশ্রাম, স্বাস্থ্য-সুখ প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়া অনাহার অনিদ্রায় তিলে তিলে জীবন বলি দিতে হইয়াছে, তোমার ব্যক্তিগত দুর্ব্বুদ্ধি, খেয়াল ও স্বার্থ-সঙ্কীর্ণ মলিন প্রবৃত্তি ও অকর্মণ্যতার জন্য সেই মহান্ প্রতিষ্ঠানের সু-উচ্চ স্বর্ণশৃঙ্গকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করিও না। তোমার জীবন ধ্বংস হয় হউক, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদা যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। যদি কখনও প্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদা ও গৌরব রক্ষা করিতে নিতান্তই অসমর্থ হও, তবে বরং মৃত্যু বরণ করিয়া সরিয়া পড়িও, প্রতিষ্ঠানকে কলুষিত করিও না। কেন না, তোমার ব্যক্তিগত জীবন অপেক্ষা প্রতিষ্ঠানের জীবনের মূল্য ও মর্য্যাদা ঢের বেশী।

প্রতিষ্ঠানকে নিতান্ত আপনার বোধে প্রাণের দরদ দিয়া সেবা করিও। আপনার জন যেমন আপনার জনের সেবা করিয়াই আনন্দ পায়, দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া পরিশ্রম করিয়াই তৃপ্তি পায়, বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা করে না, তুমিও তেমনি প্রতিষ্ঠানের সেবা করিয়া আনন্দ পাইতে চেষ্টা কর, বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা করিও না। দিনমজুরের যেমন দিনশেষে পারিশ্রমিক পাইলেই প্রাপ্য মিটিয়া যায়, সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমে যাহা সে গড়িয়া তোলে তাহার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ বা তাহাতে কোন অধিকার থাকে না, তেমনি যে কর্ম্মী শুধু নিজ স্বার্থ, যশ, মান, প্রতিষ্ঠা, প্রশংসা বা বাহাদুরী প্রভৃতির জন্য কাজ করে, তাহারও সেই সমস্ত লাভ হইলেই প্রাপ্য ফুরাইয়া যায়, প্রতিষ্ঠানের

সহিত প্রাণের কোন সম্বন্ধ, তাহার উপর নৈতিক কোন অধিকার জ
না এবং সে কখনও প্রতিষ্ঠানের অন্তরঙ্গ বা আপনার জন হইতে পারে
না। কিন্তু যে নীরবে নিঃশব্দে আপনার জনের মত শুধু প্রতিষ্ঠানের জ
কাজ করিয়া যায়, বিনিময়ে দিন-মজুরের মত (কাজের শেষে) কো
মজুরী চায় না বা কোন কিছু প্রত্যাশা করে না, সমগ্র প্রতিষ্ঠান
তাহার হয়; শুধু তাহার নিজের সেবার ফল নয়, প্রতিষ্ঠানের সম
কর্ম্মীর সেবার ফলই সে লাভ ও ভোগ করে। সে হয় প্রতিষ্ঠানে
প্রাণকেন্দ্র, কর্ম্মী-সঙ্ঘের মধ্যমণি, তাহাকে ছাড়া তখন সমস্ত কি
অচল হইয়া পড়ে। এইভাবে মানুষ যখন সমস্ত ফলাফল ইষ্টে সমর্প
করিয়া তাঁহারই সেবা ও পূজাবোধে সম্পূর্ণ নিরাকাঙ্ক্ষচিত্তে কর্ম্ম করিতে
অভ্যস্ত হয়, তখনই তাহার জীবন ও জনম সার্থক হয়, শ্রীভগবান স্বয়
তাহার নিকট সর্ব্বসিদ্ধি লইয়া উপস্থিত হন, নাম, যশ, প্রতিষ্ঠা
প্রতিপত্তির কথা তখন ভুলেও আর মনে আসে না, সে-সমস্ত তখ
কাকবিষ্ঠার মত নিতান্ত তুচ্ছ ছেলে-খেলা বলিয়া মনে হইতে থাকে
তখন সেই মুহূর্ত্তে কর্ম্মী, কর্ম্ম ও প্রতিষ্ঠান চরম সার্থকতা, পর
সিদ্ধি ও গৌরব অর্জ্জন করিয়া ধন্য হয়।

প্রশংসা ও বিরুদ্ধ-সমালোচনা

কাহারও প্রশংসা-স্তুতিতে গলিয়া যাইও না এবং কাহারও বিরুদ্ধ
সমালোচনায়ও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিও না। অনেক সময় প্রশংসা-স্তুতি
অপেক্ষা বিরুদ্ধ সমালোচনায়ই মানুষের বেশী উপকার হয়। কেন না

অযথা প্রশংসা স্তুতি মানুষকে স্বীয় দোষত্রুটি সম্বন্ধে অন্ধ ও উদাসীন করিয়া শুধু দাম্ভিক ও আত্মম্ভরী করিয়া তোলে, আর নিন্দা, বিরুদ্ধ-সমালোচনা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দোষত্রুটি গলদ ও দুর্ব্বলতা দেখাইয়া দিয়া মানুষকে আত্মশোধনে সাহায্য করে এবং তাহার বিচার ও বিবেক-বুদ্ধিকে জাগ্রত রাখে। প্রশংসা-স্তুতি মানুষের অপূর্ণতার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া, তাহার প্রকৃত অবস্থা ভুলাইয়া উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া রাখে, আর গালি মন্দ ও সমালোচনা মানুষের অপূর্ণতার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া জীবনের পূর্ণতা সাধনে সাহায্য করে।

প্রশংসাকারী-মাত্রই তোমার মিত্র এবং বিরুদ্ধ-সমালোচনাকারী মাত্রই তোমার শত্রু নয়, বরং তদ্বিপরীত। কারণ, অনেক সময় অনেক স্বার্থপর দুষ্টপ্রকৃতির লোক সহানুভূতি আকর্ষণপূর্ব্বক কোন নীচ মতলব বা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিরর্থক প্রশংসা ও চাটুবাক্যে মন ভুলাইতে চেষ্টা করে, আবার অনেক সময় অনেক অন্তরঙ্গ সুহৃদ দোষত্রুটিতে ব্যথিত হইয়া সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও ত্রুটিশূন্য করিবার সদিচ্ছায় সমালোচনা করিয়া থাকে। পিতামাতা যেমন সন্তানকে তাহার কল্যাণ ও উন্নতির জন্যই শাসন করিয়া থাকেন, পীড়নের জন্য নয়, তেমনি হিতৈষী বন্ধুগণও অনেক সময় শুধু অধিকতর উন্নত করিবার জন্যই নানাপ্রকার ভুল ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখাইয়া প্রীতির সহিতই গালাগালি দিয়া থাকে, হেয় বা অপদস্থ করিবার জন্য নয়।

*

জীবন-গঠনে যত্নশীল প্রকৃত কল্যাণকামী ব্যক্তি কখনও বিরুদ্ধ-সমালোচনায় রুষ্ট এবং প্রশংসায় উৎফুল্ল হইয়া উঠেন না। প্রকৃত বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি নিন্দা-স্তুতি উভয় ক্ষেত্রেই অন্তরের অন্তরতম

প্রদেশ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, প্রকৃতই তিনি কতটুকু প্রশংসা ও কতটুকু নিন্দার যোগ্য। স্বার্থসিদ্ধির মানসে কেহ অযথা অতিরিক্ত প্রশংসা করিলে তিনি ক্ষুন্ন হইয়া ক্ষতিকারী শত্রু বোধে বিষবৎ তাহার সংস্রব পরিত্যাগ করেন এবং কেহ সংশোধনের ইচ্ছায় বিরুদ্ধ-সমালোচনা করিলে উপকারী বন্ধু বোধে তাহার নিকট আগাইয়া আসেন—সমস্ত অভিযোগ নিঃসঙ্কোচে, নতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইয়া আত্মশোধনের চেষ্টা করেন। দুষ্টবুদ্ধিপ্রণোদিত, স্তোকবাক্যপটু চাটুকারদের অপেক্ষা সদ্বুদ্ধি প্রণোদিত বিরুদ্ধ-সমালোচকদিগকেই প্রকৃত আত্মোন্নতিকামী ব্যক্তি অধিকতর ভালবাসিয়া থাকেন। কারণ, তিনি জানেন, অনেক সময় বহু চেষ্টা করিয়াও যে দোষত্রুটি নিজে ধরা যায় না, তাহা অপরে অনায়াসেই ধরিয়া দিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনের উপায়ও নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে।

উন্নতিশীল স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি যেমন রাষ্ট্রের দোষত্রুটিগুলি দেখাইয়া দেওয়ার জন্য এক একটি আইনানুগ বিরোধী দল স্বীকার করিয়া লইয়া উহার নেতাকে সরকার হইতে ভাতা দান করেন, তেমনি প্রকৃত আত্মকল্যাণকামী ব্যক্তি সর্ব্বদার জন্য বিরুদ্ধবাদীর প্রতি প্রীতির ভাব দেখাইয়া তাহাকে তাহার মতামত ব্যক্ত করিবার সুযোগ দেন এবং ধীর ও গভীরভাবে তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিয়া আত্মশোধন ও আত্মকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন। তোমারও যে ভুল হইতে পারে তাহা ভুলিয়া যাইও না, তাহা হইলেই আর কখনও কোন কিছুতে গোল হইবে না।

—:●:—

নেতা ও নেতৃত্ব

প্রকৃত নেতা তিনি, যিনি উন্নতশির বনস্পতির মত সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা, আঘাত-আক্রমণ নিজে মাথা পাতিয়া লইয়া জাতি, সমাজ ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকে নিরাপদে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন। এ-জগতে যিনি যত বেশী ঝঞ্ঝা-দাপট ও প্রতিকূলতা সহ্য করিয়া জাতির যত বড় গুরুতর দায়িত্বভার বহন করিতে পারেন তিনিই তত বড় নেতা।

নেতার কৃতিত্ব ও সাফল্য শুধু অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সুন্দর সুন্দর কার্য্যপ্রণালী উদ্ভাবন ও কর্ম্মীদের মধ্যে সে সমস্ত বণ্টন করিয়া দিয়া সুষ্ঠুভাবে কার্য্য সম্পাদনের মধ্যে নয়, নেতার প্রকৃত কৃতিত্ব ও সাফল্য দায়িত্বভার গ্রহণের মত উপযুক্ত কর্ম্মী ও নেতা তৈয়ারীর মধ্যে। নেতা যদি দায়িত্ব গ্রহণের মত উপযুক্ত কর্ম্মী তৈরী করিতে না পারেন, তবে কার্য্যপ্রণালী যতই সুন্দর ও সময়োপযোগী হউক না কেন, তাহা কখনও সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। উপযুক্ত নেতা, উপযুক্ত কর্ম্মী ও লক্ষ্যে পৌঁছানোর মত উপযুক্ত কার্য্য-প্রণালীর একত্র সমাবেশ যেখানে, সেখানেই প্রকৃত সাফল্য ও সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

নেতা যখন দায়িত্বসম্পন্ন উপযুক্ত কর্ম্মী গড়িয়া তুলিতে পারেন তখন নেতার আসন শূন্য হইলেও কাজের কোন ক্ষতি হয় না ; রাবণের কর্ত্তিত মুণ্ড পুনঃ পুনঃ সংযোজিত হওয়ার মত উপযুক্ত কর্ম্মী আসিয়া নেতার নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়া সমস্ত কার্য্য নেতার মতই সুষ্ঠুভাবে

পরিচালন করিতে পারে, অন্যথা নেতার অভাবে কর্ম্মীরা মস্তিষ্কহীন দেহের মত প্রাণহীন নির্জ্জীব হইয়া পড়ে—সমস্ত আন্দোলন, কাজ বা প্রতিষ্ঠান সেখানেই পণ্ড হইয়া যায়। সেই প্রতিষ্ঠান, আন্দোলন ও কাজই কালজয়ী হইয়া টিকিয়া থাকিতে পারে যাহা অর্থ নয়, উপযুক্ত কর্ম্মী ও নেতার গৌরবে সর্ব্বদা গৌরবান্বিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে।

উপযুক্ত নেতা সমস্ত কর্ত্তৃত্ব নিজের হাতে রাখিয়া কর্ম্মীদের উপর কাজের ভার চাপাইয়া কর্ত্তার উচ্চাসন হইতে শুধু আদেশ নির্দ্দেশ দ্বারা তাহাদিগকে যন্ত্রের মত পরিচালন করেন না, তিনি কর্ম্মীদের সম্মুখে মহান্ আদর্শ তুলিয়া ধরিয়া তাহাদের প্রাণে কর্ত্তব্য সাধনের উৎসাহ, প্রেরণা ও গভীর দায়িত্ববোধ জাগ্রত করিয়া দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেককে নিজ শক্তি সামর্থ্যানুযায়ী দায়িত্বভার অর্পণ ও তাহা উদ্‌যাপনের জন্য সুযোগ সুবিধা ও স্বাধীনতা (প্রত্যেকের দায়িত্বের গণ্ডীর ভিতরে) প্রদান করেন। তাহাতে কর্ম্মীদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠে, সে নিজের উৎসাহে অন্তরের প্রেরণায় কর্ম্ম-সাফল্যের জন্য স্বেচ্ছায় সানন্দে আপ্রাণ পরিশ্রম করে এবং বৃহত্তর দায়িত্ব গ্রহণের উপযোগী হয়। অবশ্য কেহ দায়িত্ব ও স্বাধীনতার অপব্যবহার না করে, স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল না হইয়া উঠে তৎপ্রতিও সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে নেতাই তাহার দায়িত্ব বিষয়ে উদাসীনতার দোষে দোষী হইবেন। কারণ, অন্যের অধিকার, দায়িত্ব বা কর্ত্তব্যে অযথা হস্তক্ষেপ অথবা অতিরিক্ত

উদাসীনতা উভয়ই কুফল প্রসব করে।

সহকর্ম্মীদের নিকট হইতে যদি আন্তরিক সৌহৃদ্য ও সহযোগিতা আশাকর, তোমার গুরুতর দায়িত্বভার, দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের কিছু অংশ তাহারাও গ্রহণ করুক—ইহা যদি ইচ্ছা কর, তবে যোগ্যতা ও অধিকার অনুসারে তোমার বিরাট দায়িত্ব কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাহাদিগকে সে সম্বন্ধে ভাবাইয়া তোল এবং কিছু কিছু তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নির্ভর কর, তাহা হইলেই তাহারা তোমার সহিত যোগ্যতা অনুসারে সমান্তরাল ভাবে চিন্তা করিয়া সমান দায়িত্ববোধ ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি নিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে চলিতে পারিবে এবং তুমি যখন যেখানে যেরূপ আগ্রহ সহকারে আগাইয়া যাইবে তাহারাও তেমনি আগ্রহ সহকারে সানন্দে তোমার সঙ্গে বিনা আহ্বানে প্রয়োজনবোধে আগাইয়া যাইবে, তোমার মত তাহারাও সমস্ত অসুবিধাকে বরণ করিয়া বীরের মত বিপদের সম্মুখে বুক টান করিয়া দাঁড়াইবে।

নেতাকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে—গর্ব্বোদ্ধত শক্তির স্পর্দ্ধিত আদেশে মানুষের শরীর নড়িতে পারে, কিন্তু অন্তর সাড়া দেয় না। অন্তর সাড়া দেয় কর্ত্তব্যের ডাকে, দায়িত্বের আহ্বানে, মহান্ আদর্শের প্রেরণায়, প্রেম-প্রীতি, সমবেদনা ও সহানুভূতির সম্মোহন শক্তিতে। অহমিকাপূর্ণ কর্তৃত্বের সুরের গর্ব্বিত আদেশ কতকগুলি বিচারবুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিহীন মস্তিষ্কশূন্য সাধারণ লোক শুনিতে পারে, যতদিন ক্ষমতা হাতে থাকে ততদিন কতকগুলি অসহায়, নিরাশ্রয় অধীনস্থ ব্যক্তি স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহা মানিয়াও চলিতে পারে এবং সাময়িকভাবে

তাহাতে কিছু কাজও হইতে পারে ; কিন্তু তাহাতে কোন স্থায়ী ফল হয় না এবং কোন আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তি, কোন বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন শক্তিমান পুরুষ তাহা কখনও শোনে না, মানিয়াও লয় না। তাই ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত একটা রুদ্ধ অসন্তোষ, একটা বিরুদ্ধ মনোভাব সকলের অন্তরে নিদারুণ আক্রোশে গর্জ্জন করিতে থাকে এবং যখনই সুযোগ পায় তখনই আত্মপ্রকাশ করিয়া বিদ্রোহের সৃষ্টি করে।

এ জগতে হৃদয়ই হৃদয় জয় করে, সমবেদনা সহানুভূতিপূর্ণ অন্তরই অন্তরে সাড়া ও প্রেরণা জাগায়, নিঃস্বার্থ প্রেম-প্রীতি-ভালবাসাই মানুষের প্রাণমনের উপর সত্যিকার আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। একই লক্ষ্য এবং আদর্শ সাধনার ভিতর দিয়া জীবন-পথে অনুভূতির রাজ্যে যে ঐক্য ও মিলন, যে মধুর প্রীতির সম্বন্ধ ও সৌহৃদ্য স্থাপিত হয়, তাহাই স্থায়ী মিলন, প্রকৃত সম্বন্ধ ও সৌহৃদ্য। নিজের ও সহকর্ম্মীদের প্রাণে সাধনার এই হোমানল প্রজ্জ্বলিত কর, মহান্ লক্ষ্য ও আদর্শের বেদীমূলে একে একে দম্ভ, অভিমান, অহঙ্কার, কর্ত্তৃত্ব প্রভুত্ব, নামযশ-প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি লাভের তুষ্ট আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থপরতা সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি সব কিছু নিঃশেষে বলি দাও, শিশিক্ষু সেবাপরায়ণ ভাব লইয়া কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হও, প্রতি কর্ম্মে প্রতি পদক্ষেপে ঐশী নির্দ্দেশ লাভ করিবার জন্য সমস্ত অন্তরকে নিষ্কিঞ্চন করিয়া তদুন্মুখ করিয়া ধর—লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে, তোমার জীবনে জীবন লাভ করিয়া সমস্ত দেশ ও জাতি নূতন বিক্রমে জাগিয়া উঠিবে, তোমার শক্তি ও সাহসে শক্তিমান্ ও সাহসী হইয়া সকলে সমস্ত বিপদাপদ উপেক্ষা করিয়া লক্ষ্যপানে অগ্রসর হইবে, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি তোমারই গৃহীত

দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যকে বরণ করিয়া লইবার জন্য সাগ্রহে আগাইয়া আসিবে, তোমারই নির্দ্দেশ ও নির্দ্ধারণের জন্য সানন্দে প্রাণ বলি দিতে সকলের মধ্যে হুড়াহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবে।

★

এ জগতে প্রকৃত নেতা হওয়া ও অপরকে পরিচালন করা খুবই শক্ত। ভগবৎ কৃপায় যিনি অন্ধকারের মধ্যে আলোর সন্ধান পান, প্রজ্ঞালোকে যিনি ভবিষ্যৎ দেখিয়া পথের সন্ধান লাভ ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত নেতা হইবার যোগ্য। ভগবানকে আশ্রয় করিয়া যিনি এ জগতে একমাত্র ভগবৎশক্তি ও ভগবন্নির্দ্দেশ উপরই নির্ভর করেন, সমস্ত কর্ত্তৃত্ব, প্রভুত্ব, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব ভগবচ্চরণে অর্পণ করিয়া নিজেকে যিনি সর্ব্বদা তাঁহার সেবক বলিয়া অনুভব করেন, যিনি একমাত্র ভগবানের নিকট হইতেই তাঁহার সমস্ত শক্তি, সাহস, উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত নেতা। এ জগতে যিনি যত নিরভিমান, নিরাকাঙ্ক্ষ, যিনি যত কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য ও আদেশ পালনে তৎপর, ভগবানের ইচ্ছা এবং আদেশ অন্তরে অনুভব করিয়া নিজেকে যিনি যত বেশী পরিচালনা করিতে পারেন, তিনিই অপরকে তত বেশী আদেশ ও পরিচালন করিতে সমর্থ। নিজের উপরে যাহার যত বেশী আধিপত্য, কর্ত্তব্যের আহ্বানে সর্ব্বাগ্রে যিনি বিপদের সম্মুখে দাঁড়াইতে অভ্যস্ত, যিনি যত উদার, নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণ, নির্ভীক, স্বীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-বিরামে যিনি যত উদাসীন ও অপরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে যিনি যত তৎপর, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দায়িত্ব ও কঠোরতর কর্ত্তব্যভার বহনে যিনি যত অগ্রণী, অপরকে নিরাপদ রাখিয়া নিজেকে বিপদে ফেলিতে যিনি যত উদ্যোগী,

অপরের হৃদয়াসনের উপর তিনি তত অধিক প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন। এ জগতে তিনিই খাঁটি নেতা ও পরিচালক, যিনি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্ব্বদা অকুণ্ঠচিত্তে তিলে তিলে আত্মদান করিতে প্রস্তুত। সুতরাং যদি প্রকৃত নেতা হইতে চাও তবে সর্ব্বাগ্রে আপনার নেতৃত্বভার আপনি গ্রহণ কর, অন্য কাহারো দিকে না তাকাইয়া, অপর কাহারও উপর নির্ভর না করিয়া, একমাত্র ভগবানকে স্মরণ ও সহায় করিয়া উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মৃত্যুপণ পূর্ব্বক তাঁহার পতাকা হস্তে সাহস সহকারে আগাইয়া যাইয়া জাতি ও সমাজের পুরোভাগে দাঁড়াও। কেহ যদি পিছনে না আসে, তবে তুমি একাই আগাইয়া যাও, কেহ যদি সাড়া না দেয়, তবে তুমি একাই তোমার অন্তরের আহ্বানে সাড়া দাও, অন্ধকারে যদি পথ না দেখ, তবে বিবেকের আলো জ্বালাইয়া লও, তাহা হইলেই জাতি, সমাজ ও প্রতিষ্ঠান তোমায় বরণ করিয়া লইবে, সকলে অগ্রণী হইয়া হৃদয়ের অর্ঘ্য দিয়া নেতার আসনে তোমাকে প্রতিষ্ঠা করিবে।

ওঁ শম্

—ঃ*ঃ-

আত্মরক্ষা

এ জগতে শক্তিহীন দুর্ব্বল, আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন যে, শত শত রক্ষক, সহস্র সহস্র রক্ষাকবচও তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না যদি না সে নিজে শক্তি সঞ্চয় করিয়া আত্মরক্ষায় উদ্যোগী হয়। মানুষ যদি নিজের শক্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইতে না পারে, তবে অপরে তাহাকে দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারে কত সময়? সুতরাং কোনও

ব্যক্তি, সমাজ বা মানবসমষ্টিকে যদি অন্যায় অত্যাচারের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয়, তবে প্রথমেই চাই শক্তিচর্চ্চা ও শক্তির অনুশীলন দ্বারা প্রত্যেকের যথোপযোগী শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জ্জনের ব্যবস্থা ; তাহার পর চাই সকলের প্রাণে গভীর আত্মবিশ্বাস এবং অত্যাচার উৎপীড়নের প্রতিরোধ ও প্রতিকার-কল্পে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কৌশল সহকারে শক্তি প্রয়োগের দুর্জ্জয় সাহস ও উদগ্র আকাঙ্ক্ষা। মানুষ যতই সবল, শক্তিমান হউক না কেন, সে যদি নির্ভীক, সাহসী ও কৌশলপরায়ণ না হয়, তবে তাহার শক্তিসামর্থ্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন কাজে লাগে না। তাই শক্তি অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি প্রয়োগের সাহস ও আগ্রহ জাগ্রত করিয়া দিয়া উপযুক্ত রক্ষক ও রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করতঃ অত্যাচারীর কবল হইতে অত্যাচারিতের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এখানে একটা কথা সকলকে খুব ভালভাবে জানিয়া রাখিতে হইবে যে, মানুষ নিজেই নিজের রক্ষক, অপরে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না, পারে শুধু সাহায্য করিতে। মানুষ যদি ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া আত্মশক্তিতে শক্তিমান, আত্মবিশ্বাসবলে বলীয়ান্ হইয়া নির্ভীকভাবে আত্মরক্ষার্থ দণ্ডায়মান হয়, জীবন দিব তবু অত্যাচারীর নিকট আত্মসমর্পণ করিব না—এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মরিয়া হইয়া সংগ্রাম চালায়, তবে তাহাকে কেহ ধ্বংস করিতে পারে না। আর সে যদি ভগবানকে বিস্মৃত হইয়া আত্মশক্তিতে আস্থা হারাইয়া দুর্ব্বলতা, ভীরুতা ও কাপুরুষতাকে আশ্রয় করিয়া আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন থাকে, তবে এ জগতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

অত্যাচারী দুষ্টদুর্ব্বৃত্তের প্রকৃতপক্ষে কোন দোষ নাই, কারণ স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত যে, সুযোগ সুবিধা পাইলে সে অত্যাচার উৎপীড়ন করিবেই; ইহা তাহার স্বভাব—প্রকৃতি। কিন্তু আমরা দুর্ব্বল ভীরু কাপুরুষ সাজিয়া আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন থাকিয়া তাহাকে সে সুযোগ সুবিধা দিব কেন? এ জগতে সাহস ও পৌরুষহীন ক্লীব নপুংসকের নিশ্চেষ্টতা ও কাপুরুষতাই অত্যাচারী দুষ্টদুর্ব্বৃত্তের অন্তরে অত্যাচারের স্পৃহা ও সাহস জাগ্রত করিয়া তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া আনে, দুর্ব্বলতা ভীরুতাকে প্রশ্রয় দিয়া অত্যাচারীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া নিজেদের উপর অত্যাচার উৎপীড়নের সুযোগ দেয়। পক্ষান্তরে, নির্ভীক শক্তিমান পুরুষের অমিত তেজ, দুর্দ্দমনীয় শৌর্য্যবীর্য্য, বিক্রম-পরাক্রম ও সাহসই দুর্ব্বৃত্তের প্রাণে ভীতির সঞ্চার করিয়া পলায়নে বাধ্য করে। দুষ্টদুর্ব্বৃত্ত যদি বুঝিতে পারে যে, সামান্য একটু আঘাত আক্রমণেই ফেরুপালের মত সকলে পলায়ন করিবে, তবে তাহারা তাহা না করিবে কেন? আর তাহারা যদি মনেপ্রাণে জানে যে, আঘাত বা অত্যাচার উৎপীড়ন করিলে তাহা অন্ততঃ দশগুণ প্রতিঘাত নিয়া ফিরিয়া আসিবে, তবে তাহারা তাহা করিতে যাইবে কিসের আশায়? মানুষের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা ও নিশ্চেষ্টতাই অপরকে তাহার উপর অত্যাচারে প্ররোচিত করে। ভয়কে অন্তরে স্থান দিলে, অত্যাচারীর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেই অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, আর তেজবীর্য্য বিক্রম পরাক্রম প্রদর্শন করিলেই অত্যাচারীর প্রাণে ভীতির সঞ্চার হয়; সুতরাং আজিকার এই ঘোর দুঃসময়ে মানুষের ঘুমন্ত পৌরুষ ও সুপ্ত বীর্যকে আবার জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে, সুপ্ত সাহস ও শৌর্য্যকে আত্মরক্ষার

কাজে নিয়োগ করিয়া প্রকৃত জীবনের পরিচয় দিতে হইবে এস অত্যাচারিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, ধর্ম্মান্তরিত, হৃতসর্ব্বস্ব নরনারি! এস, যুগাচার্য্যের অভয় চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অভীঃ মন্ত্রে দীক্ষা লও, শক্তি-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া নূতন তেজোদীপ্ত ভাস্বর জীবন লাভ কর। ঐ দেখ উপবিষ্ট মহান আচার্য্য, মহাশক্তির প্রতীক শাণিত সুদীর্ঘ ত্রিশূল হস্তে তোমাদিগকে বরাভয় দানের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, ঐ শুন, কম্বুকণ্ঠে তিনি নবযুগের মহামুক্তি ও শক্তি-মন্ত্র উদগান করিয়া তোমাদিকে আশ্বাস দিতেছেন—

"দুর্ব্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতাই মহাপাপ, বীরত্ব, পুরুষত্ব মনুষ্যত্ব ও মুমুক্ষুত্বই মহাপুণ্য।" তোমরা আজ দুর্ব্বলতা-ভীরুতা-কাপুরুষতারূপ মহাপাপ পরিত্যাগ করিয়া বীরত্ব পুরুষত্বরূপ মহাপুণ্যকে জীবনে বরণ করিয়া লও, আত্মরক্ষার সুদৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া সকলে সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হও, স্বয়ং ভগবান তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন।" ওঁ শান্তিঃ! শান্তি!! শান্তি!!! হরি ওঁ

—:*:—

জীবনের গতিপথে

কর্মক্ষেত্র-মাত্রই সংগ্রাম-ক্ষেত্র। কর্মক্ষেত্রেই কর্মীর প্রকৃত পরীক্ষা, জীবনে ক্রমোন্নতি বা প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে এই পরীক্ষা ক্রমশঃ কঠোরতর হইতে থাকে। এই মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই অনন্ত কল্যাণ—পরম প্রাপ্তি, আর বিপর্য্যয়ে চরম বিলুপ্তি—মহতী বিনষ্টি। কিন্তু ভাবিলে বা ভয় করিলে চলিবে না। শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া, দুর্জ্জয় সাহসে বুক বাঁধিয়া সমস্ত বাধাবিঘ্ন বিপত্তিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে সংগ্রাম করিতে হইবে। পুরুষ-সিংহ যিনি তিনি তাহাই করেন—করিয়া বিজয়ীর বরমাল্য প্রাপ্ত হন। কর্মী-মাত্রেরই এই মহান্ আদর্শ বরণীয়, অনুসরণীয়।

চঞ্চলতা চপলতা পরিহার কর, দুর্বলতা ভীরুতাকে বিসর্জন দাও। "ধৈর্য্য স্থৈর্য্য সহিষ্ণুতাই—মহাশক্তি, বীরত্ব পুরুষত্ব মনুষ্যত্বই মহাপুণ্য" সঙ্ঘনেতা মহান্ আচর্য্যের এই মহাবাণীকে মহামন্ত্রজ্ঞানে সর্বদা অনুধ্যান ও অনুসরণ কর। কোন প্রকার হতাশা নিরাশা বিষাদ অবসাদ যাহাতে মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত করিতে না পারে সেই জন্য সর্বদা সাবধানে থাক।

সর্বপ্রকার অপ্রত্যাশিত ব্যবহার, সমস্ত রকম বিরোধী মনোভাব ও অনভীপ্সিত আলোচনা সমালোচনাকে শ্রীভগবানের আশীর্বাদ ভাবিয়া সানন্দে বরণ করিয়া লও। কোন্ প্রকার নিন্দা গালি তিরস্কার ভর্ৎসনা বা বিরুদ্ধাচরণে বিচলিত হইও না;

"কেহ বা তোমারে মালা পরাইবে,
কেহ বা তোমারে পদ প্রহারিবে।
কিছুতেই চিত্তের প্রশান্তি ভেঙ্গোনা।
সদাই আনন্দে রহিবে মগনা ওঁ তৎ সৎ ওঁ"

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের এই উদাত্ত সঙ্গীত কর্মসাধনায় ব্রতী কর্মীমাত্রেরই দিগ্দর্শনমন্ত্র।

মনে রাখিও—চলিতে চলিতে যে শ্রান্ত হয় তাহার নানা প্রকার শ্রী লাভ হয়। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র তাহার সখা।...যে শয়ন করিয়া থাকে ভাগ্য তাহার শায়িত থাকে। যে উঠিয়া বসে ভাগ্য তাহার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বসে। আর যে চলিতে থাকে ভাগ্যও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে থাকে।...যে চলে সে মধু প্রাপ্ত হয়, যে চলে সে অমৃতময় সুস্বাদু উদুম্বর ফল লাভ করে; কিন্তু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও যদি নিশ্চেষ্ট অবস্থায় শয়ন করিয়া থাকে তবে সে অবজ্ঞাত হয়। সুতরাং পথে চল—'চরৈবেতি';—দিব্যদ্রষ্টা ঋষির চলার মন্ত্রকে জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া লও, কিছুতেই নিশ্চেষ্ট থাকিও না। পড়িতে পড়িতে উঠিয়া দাঁড়াও, (টাল সামলাইয়া) দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে চলিতে আরম্ভ কর। সদা প্রবহমান কালপ্রবাহের উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া জীবন-পথের পাথেয় সঞ্চয় করিতে করিতে অগ্রসর হও—চলিতে থাক বিরামহীন দুর্নিবার গতিতে।

একটী মুহূর্ত্তও যেন আর বৃথা অতিবাহিত না হয়, একটী নিমেষও যেন হেলায় খেলায় না কাটে, চোখের একটা পলকও যেন ব্যর্থ ভাবে না পড়ে। যে দিনটী চলিয়া গেল সেই দিনটী আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। কিন্তু যেভাবে সেই দিনটী অতিবাহিত হইল

তাহা তোমার জীবন-গ্রন্থে ঠিক সেই ভাবেই চিরতরে মুদ্রিত হইয়া থাকিল, কোন ক্রমেই তাহার আর পরিবর্তন ঘটিবে না। কিন্তু ইহ শুধু অন্ধকারময় অতীতের গহ্বরেই অদৃশ্য হইয়া থাকিবে না। অনাগত ভবিষ্যতের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিবে যুগ-যুগান্তর-জন্ম-জন্মান্তর। সুতরাং মহদ্ব্যক্তিগণের আদর্শ অনুসরণ কর। "সেকেণ্ড মিনিটের কাটার গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার সাধনার গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়াছি, তোমরা প্রতি মাসে মাসে তাহা করিবে"—শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতার এই মহাবাণীকে সর্ব্বদা স্মৃতি-পথে রাখিয়া জীবন-পথে চল।

দুঃখ-দুর্দশায় ভাঙ্গিয়া পড়িও না, ব্যর্থতার গ্লানিতে মুহ্যমান হইও না। স্মরণ কর তথাগত বুদ্ধের (বোধিলাভের পূর্বমুহূর্তে গৃহীত বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্প—'এই আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় আমার শরীর যদি শুষ্ক হয়, ত্বগস্থিমাংস যদি পচিয়া গলিয়া ধ্বংস হইয়া যায় তথাপি বহু-কল্প দুর্লভ বোধি লাভ না করিয়া আমি এই আসন ত্যাগ করিব না।' ইহাই বীরব্রত, বীর্য্যবানের জীবনবেদ।

কালক্রমে স্বাভাবিকভাবে তোমার উপর যে সুমহান্ দায়িত্বভার আসিয়া পড়িয়াছে তাহা সুসম্পন্ন করিবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা কর। অনন্ত শক্তির আধার যিনি তাঁহার শ্রীচরনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা জানাও, ব্যাকুলভাবে তাঁহার শ্রীচরণে নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দাও, দেখিবে শক্তির অভাব হইবে না। যিনি দায়িত্বভার দিয়াছেন তিনিই নূতন করিয়া শক্তি সঞ্চার করিবেন, সর্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন অপসারিত করিয়া কণ্টকাকীর্ণ পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দিবেন। চতুর্দিকে বিপদের বেড়াজাল, নিদাঘ-মধ্যাহ্নে

কাল-বৈশাখীর ঘনঘটা, মুহুর্মুহুঃ অশনিপাত, সৃষ্টিবিধ্বংসী মহাকালের প্রলয় তাণ্ডব; কিন্তু তাহা শুধু ক্ষণিকের জন্য। মুহূর্ত পরে আবার নির্মেঘ আকাশ, আবার সৌরকরোজ্জ্বল সুন্দর পৃথিবী, আবার মৃদুমন্দ মলয় হিল্লোল। বিস্ময়ে অভীভূত হইবে শ্রীভগবানের সেই পরম সুন্দর কৃপাঘন দিব্য রূপ দর্শনে, আর পুলকিত হইবে সেই কুসুম-কোমল, স্নেহশীতল হস্তের অমিয় মধুর স্পর্শে।

প্রশান্ত মহাসাগরের মত সুগভীর প্রশান্তি চাই। এই ধূলি-মলিন জগতের কোন প্রকার মালিন্য যেন সেই প্রশান্তি নষ্ট করিতে না পারে। বিরাট দায়িত্ব, গুরুতর কর্ত্তব্য সম্মুখে। মহান্ সেই দায়িত্ব কর্ত্তব্যের কথা চিন্তা কর। আর নিজেকে সর্বতোভাবে উপযুক্ত করিয়া তোল। শুধু গতানুগতিক কর্ম, শুধু বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতার দিক দিয়া নয়, ভাবের দিক, নীতি-ধর্ম-আদর্শ-সাধনা ও অনুভূতির দিক দিয়াও। "মানসিক অবস্থার এমন পরিবর্তন লইয়া সর্বত্র উপস্থিত হইতে হইবে যাহাতে প্রত্যেকেই তোমাদের সঙ্গ করিয়া একটা প্রভাব অনুভব করিতে পারে"—শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতার এই নির্দ্দেশবাণীকে অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হও যাহাতে তোমার ভাগবত জীবনের উদ্দীপনায় সকলে উদ্দীপিত হইয়া উঠিতে পারে।

স্বর্ণকার যেমন একতাল স্বর্ণকে অগ্নিতাপে তপ্ত ও তরল করিয়া আঘাতে আঘাতে সুন্দর ও সুদৃশ্য অলঙ্কার তৈরী করে তেমনি তোমার জীবনের রূপকার যিনি তিনিও তোমাকে প্রতিনিয়ত পরীক্ষার অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতঃ শ্রদ্ধাশীল, নির্ভরশীল, ঘাতসহ মজবুত করিয়া প্রকৃত মানুষ হিসাবে, জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী বীর হিসাবে গড়িয়া তুলিতেছেন। সুতরাং সমস্ত ভয় ভাবনা শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া

নির্ভয়ে পথ চল। বহু ঝড়ঝঞ্ঝা অতিক্রম পূর্ব্বক যাঁহারা জীবন-সাগরের কূলে উপনীত, সহস্র সংগ্রামজয়ী মৃত্যুঞ্জয়ী সেই সমস্ত বীর সাধকদের পাশে দাঁড়াও।

জীবন-গঠনের সাধনা

জীবন-গঠন সত্যই বড় দুরূহ ব্যাপার। এই জন্য অস্থির হইলে, ধৈর্য্য হারাইলে চলিবে না। যে ব্যক্তি বীজ বপন করিয়াই ফল লাভ করিতে চায়, কাজ আরম্ভ করিয়াই সিদ্ধির জয়মাল্য পাইবার জন্য লালায়িত হয় তাহার চেয়ে কৃপার পাত্র কে থাকিতে পারে?

একবার স্মরণ করিয়া দেখ—প্রথমে বর্ণমালা শিখিতে, লেখা অভ্যাস করিতে কত কষ্ট, কত বিরক্তি বোধ হইয়াছিল। কিন্তু এখন আর তাহা হয় না, সমস্ত কিছু কেমন সহজ হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক কাজেরই আরম্ভের সময় ঐরূপ হয়, পরে অভ্যাস হইয়া গেলেই আর কোন কষ্ট থাকে না, বরং আনন্দ পাওয়া যায়। জীবন-গঠনের বেলায়ও তদ্রূপ। সুতরাং সফলতা বিফলতার দিকে না তাকাইয়া প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিয়া যাও। শুধু চাই চেষ্টা যত্ন, উদ্যম অধ্যবসায়—প্রতিদিন প্রতিক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। ধৈর্য্য ধরিয়া যদি নিত্য নিরন্তর নিয়মিতভাবে চেষ্টা করিতে পার তবে প্রতিবারের চেষ্টাই তোমাকে পরবর্ত্তী বারের চেষ্টায় সহায়তা করিবে, শক্তি, সাহস ও উৎসাহ দান করিবে। এ জগতে ধৈর্য্যই ধৈর্য্য-শক্তি যোগায়, সাহসই সাহসকে বাড়াইয়া দেয়, চেষ্টাযত্নই

চেষ্টাযত্নের সামর্থ্য দান করে। প্রত্যেক কাজ, প্রত্যেক অনুষ্ঠানেরই একটা অন্তর্নিহিত শক্তি, একটা নিজস্ব গতিবেগ আছে। কাজ আরম্ভ করিলে সেই শক্তি, সেই গতিবেগই মানুষকে স্বীয় পথে, নিজস্ব ভঙ্গিতে চালাইয়া লইয়া যায়। একদিনও সৎপথে চলিলে, বিন্দুমাত্র সদ্‌গুণের অনুশীলন করিলে ভিতরে সিংহশক্তির সঞ্চার হয়, সমস্ত দুর্ব্বলতা, সমস্ত ভয় ভাবনা দূর হইয়া যায়। সুতরাং কোন প্রকার দ্বিধা সঙ্কোচ না করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া চলিতে থাক, নিজেই নিজের উন্নতি দেখিয়া বিস্মিত হইবে। ঐ শুন শ্রীশ্রীসঙ্ঘ-নেতার অভয়বাণী—"ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতাই সাধকের মহাশক্তি।" এই মহাবাণী সর্ব্বদা ধ্যান কর, অনুসরণ করিয়া চল।

খুব আত্মবিশ্বাস চাই। অন্য সকলে যাহা পারে তুমি তাহা পারিবে না কেন? নিশ্চয়ই পারিবে। মানুষই অসাধ্য সাধন করে, মানুষই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তোলে। অতীতে তোমার নিকট যাহা অসাধ্য বা অসম্ভব ছিল তাহা যখন আজ সাধ্য ও সম্ভব হইতেছে, তখন আজিকার অসাধ্য ও অসম্ভাব্য যাহা তাহাই বা ভবিষ্যতে সাধ্য ও সম্ভব হইবে না কেন? নিশ্চয়ই হইবে। তবে তাহার জন্য উপযুক্ত শ্রম, উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে—কঠোর সাধনা (চেষ্টা যত্ন) করিতে হইবে। ফাঁকি বা গোঁজামিল দিয়া এ-জগতে কোন দিন কিছু হয় নাই, হইবেও না। সুতরাং সেদিকে পদক্ষেপ করিও না। অনায়াসে, অল্পায়াসে কাজ হাসিল করিবার কথা ভাবিও না। সর্ব্বপ্রকার সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাসকে তাড়াইয়া দাও। দ্বিধা সঙ্কোচ দূর করিয়া, আত্মবিশ্বাসবলে বলীয়ান হইয়া জীবন-সাধনায় ব্রতী হও—সাফল্য সুনিশ্চিত।

কুসঙ্গীদের নিকট হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতে হইবে। যাহারা কুপ্রবৃত্তি জাগ্রত করিয়া কুকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে তাহাদিগকে হিংস্র জানোয়ারের মত মনে করিবে। ইহারাই তোমাদের প্রথম ও প্রধান শত্রু। শুভ্র শেফালীর মত কত শত নির্ম্মল চরিত্র, পবিত্র, সরল প্রকৃতির বালক, কিশোর ও যুবক যে ইহাদের কবলে পড়িয়া ধ্বংস হইয়াছে ও হইতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করে? কখনও হিতকারী বন্ধুর মুখোস পরিয়া, কখনও বা পরামর্শদাতা উপদেষ্টা সাজিয়া, আবার কখনও পড়াশুনা বা অন্য বিষয়ে সাহায্য করিবার অছিলা ধরিয়া ইহারা তোমাদের নিকট উপস্থিত হইবে। তাহার পর ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইলে সময় সুযোগ বুঝিয়া কুমতলব সিদ্ধির চেষ্টা করিবে। শিকারী যেমন শিকার ধরিবার জন্য ওৎ পাতিয়া থাকে এবং সুযোগ উপস্থিত হইলেই তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, ইহাদের স্বভাবও ঠিক তদ্রূপ। সুতরাং সাবধান। যখনই কেহ বিনা প্রয়োজনে অযাচিতভাবে তোমার সম্বন্ধে অস্বাভাবিক মনোযোগ দিতেছে, কারণে অকারণে অত্যধিক আগ্রহের সহিত বিশেষভাবে শুধু তোমারই (তাহার স্বভাব বা প্রকৃতির বিরুদ্ধে) সহায়তার জন্য আগাইয়া আসিতেছে, সর্ব্বদা তোমাকে অতিরিক্ত দরদ, প্রীতি ও আপনার ভাব দেখাইয়া তোমার সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যগ্র, কোন না কোন উপলক্ষ্য বা অছিলায় তোমাকে কিছু দিতে ও তোমার প্রয়োজন সাধন করিতে উদ্‌গ্রীব তখনই বুঝিবে—উহা কখনও উদ্দেশ্যহীন বা কলুষমুক্ত নয়, কোন পাপ, কোন কুমতলব উহার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে। সুতরাং কখনও ইহাদের প্রশ্রয় দিবে না; কোন প্রকার দুর্ব্বলতা প্রকাশ না করিয়া সর্ব্বদা ইহাদের সংস্রব হইতে দূরে থাকিবে। তবুও যদি

আগাইয়া আসে তবে কঠোরভাবে উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান করিবে।

কুচিন্তা, কুভাবনা ও কুপ্রবৃত্তিকে কখনও হৃদয়ে স্থান দিও না। ইহারাই কুকার্য্যের প্ররোচক ও প্রবর্ত্তক, মানুষকে কুপথগামী করিবার সহায়ক। সাধারণতঃ কিশোর, বালক ও যুবকদের কুসুম-কোমল, সরল অন্তরই ইহাদের পরম রমণীয় ও লোভনীয় ক্রীড়াক্ষেত্র। দুষ্ট কীটের মত ইহারা মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া মানুষকে ধ্বংস করিয়া ফেলে, ঘুণের মত একেবারে অন্তঃসারহীন করিয়া দেয়। ক্ষয়রোগের বীজাণুর মত ইহারা মানুষকে তিলে তিলে জীবনীশক্তিহীন করিয়া মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া লইয়া যায়। ইহাদের এমনই একটা নেশা বা মাদকতা আছে যে, প্রথমে কিশোর ও যুবকগণ তাহা বুঝিতে পারে না, বরং আনন্দে আত্মহারা হইয়া একেবারে দেহ-মনঃপ্রাণ এলাইয়া দেয়। কিন্তু কিছুদিন পর যখন প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, শরীরে ভাঙ্গন ধরে, চোখের কোনে কালি পড়ে, মনে বিষাদ ও অবসাদ আসে, তখন সব কিছুই বুঝিতে আরম্ভ করে; কিন্তু এমন অবস্থায় যাইয়া পৌঁছায় যে আর ফিরিয়া আসিবার উপায় থাকে না, শক্তি থাকে না। তখন জীবন নিতান্ত দুর্ব্বহ হইয়া উঠে, বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হয়। আত্মহত্যা করিয়া সমস্ত জ্বালার অবসান করিতে ইচ্ছা হয়। তাই বলি হুসিয়ার! কিছুতেই, কোন ক্রমেই এই পাপকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিবে না। তুমি যেমন তোমার বাড়ীর মালিক, সেখানে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া না দেওয়ার কর্ত্তা, তেমনি তোমার হৃদয়, তোমার মনেরও মালিক তুমি, সেখানে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া না দেওয়ার কর্ত্তাও তুমি। কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে যেমন তোমার গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ কর, তেমনি এই অবাঞ্ছিত চিন্তা,

ভাবনা, প্রবৃত্তিকেও নিষেধ করিবে। হৃদয়-দ্বারে বিবেকরূপ প্রহরী সর্ব্বদা নিযুক্ত করিয়া রাখ। যখনই উহারা তোমার ভিতরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইবে তখনই নিষেধ করিবে, সবলে বাধা দিবে। যাহারা তোমার ধ্বংস সাধনে সমুদ্যত, স্বাস্থ্য, শক্তি, আয়ু ও শান্তি কাড়িয়া লইতে নিযুক্ত, তাহাদিগকে আততায়ীর মত হত্যা করাই কি উচিৎ নয়? সাবধান! এই বিষয়ে ভুল করিও না, আত্মপ্রতারণা করিও না। আততায়ী শুধু বৈষয়িক ক্ষতি করে না, স্থূল দেহের নাশ—এই জীবনও ধ্বংস করে। কিন্তু কুচিন্তা, কুভাবনা, কুপ্রবৃত্তি মানুষের সৎপ্রবৃত্তি, সৎসংস্কার ও সদ্‌গুণ সমূহ নষ্ট করিয়া বহু জন্ম গ্রহণ করাইয়া বহু জীবন ধ্বংস করে—অশান্তির আগুনে পুড়াইয়া বহুকাল অসহ্য—যন্ত্রণা ভোগ করায়।

আক্রমণকারী শত্রু সৈন্যের বিরুদ্ধে যেমন সর্বদা সচকিত, জাগ্রত ও সশস্ত্রভাবে পাহারা দিতে হয়, জীবন গঠনের-সাধককেও তেমনি কুসঙ্গী, কুচিন্তা ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সদা জাগ্রত অবস্থায় পাহারা দিতে হয়। কখনও শত্রুবেশে, কখনও মিত্রভাবে, কখনও ছদ্ম-বেশে, আবার কখনও বা এক মুহূর্ত্ত পরেই ফিরিয়া যাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া উহারা তোমার অন্তরে প্রবেশের পথ করিয়া লইতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু বিশেষভাবে মনে রাখিও—একবার যদি উহারা তোমার বিবেক—তোমার বিচার-বুদ্ধিকে প্রতারণা বা মুগ্ধ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে তবে আর তুমি কিছুতেই উহাদিগকে প্রতিহত করিতে পারিবে না। দুর্গ-প্রাচীরে ফাটল ধরাইয়া অবরোধ ভাঙ্গিতে পারিলে যেমন সেই পথে সহস্র সহস্র শত্রুসৈন্য ভিতরে প্রবেশ করিয়া দুর্গ দখল করিয়া বসে, এখানেও তেমনি তোমাকে

প্রলুব্ধ করিয়া একবার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, সাধননিষ্ঠা ও মনোবল ভাঙ্গিয়া দিতে পারিলে সেই ছিদ্রপথে উহারা তোমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত হৃদয় মন দখল করিয়া বসিবে। সুতরাং যখনই কুচিন্তা, কুপ্রবৃত্তি আসিবে তখনই রীতিমত ধমক দিবে। হৃদয় মন তোমার—তুমি যদি স্বেচ্ছায় সেখানে কাহাকেও প্রবেশ করিতে না দাও তবে কাহার সাধ্য সেখানে প্রবেশ করে? এখানে নরম হইলে বা ভয় করিলে চলিবে না। জীবন-মরণ সমস্যা যেখানে সেখানে কি নরম হইলে চলে? এখানে সুমেরু অপেক্ষা দৃঢ়, সমুদ্র অপেক্ষা গম্ভীর, বজ্রাপেক্ষাও কঠোর হইতে হইবে।

সর্ব্বপ্রকার কোমলতা, কমনীয়তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেল। সাধন জীবনে, তপস্যার জীবনে, শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের সময়ে কোমলতা, কমনীয়তার কোন স্থান নাই। এখানে যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রামরত সৈনিকের মত নির্ম্মম হইতে হইবে। যে কোন দোষ ত্রুটি দুর্ব্বলতা, যে কোন আদর্শ বিরোধী ভাবকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে হইবে। ইহাতে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যদি বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, সমস্ত পৃথিবীর দরদীরা আসিয়া যদি চোখের জল ফেলে তবুও ভ্রুক্ষেপ করিবে না। স্বীয় কর্ত্তব্য পালন, আদর্শ অনুসরণ করিয়া বীরের মত আগাইয়া যাইবে। জীবন-গঠনের সাধনায় অত সহজে ভড়কাইলে চলে না। মারের প্রতি বুদ্ধদেবের, শয়তানের প্রতি যীশুখৃষ্টের সেই বজ্রগম্ভীর নির্দ্দেশ স্মরণ কর, মদন ভস্মকারী দেবাদিদেব মহাদেবের সেই রুদ্রমূর্ত্তি ধ্যান কর। খাঁটি সাধকের উহাই তো প্রকৃত রূপ, প্রকৃত স্বভাব।

সৎ পথের সহযাত্রী খুব কম। উপযুক্ত সঙ্গী যদি না পাও

তবে একাই চলিতে হইবে। অন্য কোন দিকে তাকাইবে না; তাকাইবে শুধু আদর্শের দিকে, জীবনের লক্ষ্যের দিকে। আদর্শ ও লক্ষ্যের দিকে তাকাইয়া দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিবে। চারিদিকের জগৎ কিভাবে চলিতেছে, এতদিনের কে কি করিতেছে না করিতেছে তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। সহ-যাত্রীদের মধ্যে কে সঙ্গে আসিল, কে পিছনে পড়িল সে দিকেও দৃষ্টি দিবার আবশ্যক নাই। তুমি শুধু তাকাইয়া দেখ যে, তোমার আদর্শানুযায়ী তোমার জীবনের প্রতিটি কাজ অনুষ্ঠিত হইতেছে কি-না, তীব্র গতিতে জীবনের লক্ষ্যপানে অগ্রসর হইতে পারিতেছে কি-না। তোমার আদর্শ তোমাকে অনুসরণ করিতে হইবে, তোমার লক্ষ্য স্থানে তোমাকে পৌঁছিতে হইবে। ইহার সহিত অন্যের কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে? এ জগতে তোমার শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগী তুমি, তোমার ভালমন্দের জন্য দায়ী তুমি, অন্য কেহ নয়। অন্যে শুধু তোমাকে সাহায্য করিতে পারে; কিন্তু সব কিছু করিতে হইবে তোমাকেই। সুতরাং তোমাকে তোমার ভাবে, তোমার আদর্শে চলিতে হইবে। অন্য সকলে যদি জীবন-গঠনে নিশ্চেষ্ট বা উদাসীন থাকে তাহা হইলেও তোমাকে নিশ্চেষ্ট বা উদাসীন থাকিলে চলিবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্র পরীক্ষায় সম্মানজনক স্থান অধিকার করিতে চায় তাহার কি সাধারণ ছাত্রের মত হৈ-হুল্লোড় করিয়া বেড়াইলে চলে? সুতরাং তোমাকেই বা তাহা করিলে চলিবে কেন? কোন আত্মঘাতী ব্যক্তি যদি নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করে তবে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি যেমন তাহার অনুসরণ করে না, তেমনি অজ্ঞ ব্যক্তিরা যদি স্বীয় দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য, জীবনের মহান্ আদর্শ লক্ষ্য

বিস্মৃত হইয়া ভ্রান্ত পথে চালিত হয় তবে কোন বিবেকী বা বিচারসম্পন্ন ব্যক্তিই তাহার দিকে ফিরিয়া তাকায় না। মহাপুরুষদের জীবনই ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সর্বপ্রকার বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাদের ভাবে, তাঁহাদের গন্তব্যপথে চলিয়া সমগ্র জগদ্বাসীর নিকট এক মহান্ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া যান। তাঁহাদের সেই মহোচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিয়াই জীবনকে আজ সর্ব্বতোভাবে গড়িয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। ইহাই জীবনকে মহান্ ও গরীয়ান্ করিয়া তুলিবার পথ।

অন্তর্বাণী

'আমি ন্যায্য কথা বলিতে কাহাকেও ছাড়ি না'—এই ধরণের আত্মম্ভরিতাপূর্ণ কথা, অনেকের মুখেই শুনা যায় এবং যাহারা বলেন তাহারা যেন একটু গর্ব করিয়াই ইহা বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রশ্ন— এই ন্যায্য-অন্যায্য বা ন্যায়-অন্যায় বিচার করিবে কে? অর্থাৎ আমিই আমার ন্যায্য অন্যায্যতার বিচার করিব, না অপরে করিবে? পরীক্ষার্থী নিজের খাতা দেখিয়া সসম্মানে উত্তীর্ণ বলিয়া ঘোষণা করিবে, না পরীক্ষক? সুতরাং কি বলিতেছি, তাহা বলিবার পূর্বে শান্তভাবে স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীর কোন্‌টা ভুল ও কোন্‌টা শুদ্ধ তাহা বিচার করেন শিক্ষক ও পরীক্ষক। আসামী প্রকৃতই অপরাধী অথবা নিরপরাধ তাহা বিচার করেন আইনজ্ঞ বিচারক, আবার বিচারকেরও

বিচারের যাথার্থ্য বিচার করিয়া দেখেন ক্রমানুসারে উচ্চতর পর্য্যায়ের ন্যায়াধীশগণ। এমতাবস্থায় আমার কথার ন্যায্যতা-অন্যায্যতা বিচারের যোগ্য অধিকারী আমি নই, তাহা বিচারের প্রকৃত যোগ্যতা ও অধিকার আমার অপেক্ষা যাঁহারা বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ তাঁহাদের।

* * *

সাধারণ মানুষ তো অতি তুচ্ছ; ন্যায়-অন্যায়, ধর্মাধর্ম, কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ণয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিগণও বিমূঢ় হইয়া পড়েন। এ-জগতে একমাত্র স্থিতপ্রজ্ঞ, স্থিতধী, সত্য ও তত্ত্বদ্রষ্টা ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যগণই অভ্রান্ত নির্দেশ দিতে পারেন, অন্য কেহ নহে।

যে যাহা কিছু বলিবে বা বুঝাইবে তাহা যতটা সম্ভব ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিবে ও বুঝিতে চেষ্টা করিবে; কিন্তু সহসা কিছু বলিতে বা বুঝাইতে যাইবে না। তাহা হইলে অনেক বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

উত্তেজনার যত কারণই থাকুক বা ঘটুক না কেন, হঠাৎ কিছুতেই উত্তেজিত বা আত্মবিস্মৃত হইবে না। যখন মস্তিষ্ক উত্তপ্ত, মেজাজ উগ্র ও মন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিবে তখনই উত্তেজনাস্থল বা তাহার কারণ হইতে দূরে সরিয়া যাইয়া কোন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবে এবং ভগবৎস্মরণ ও নাম করিতে থাকিবে। ইহাই উত্তেজনা প্রশমনের অমোঘ উপায়।

আকস্মিক উত্তেজনা বড় সাঙ্ঘাতিক। ইহা শুধু অপরেরই ক্ষতি করে না, নিজেরও সর্বনাশ ডাকিয়া আনে। হঠাৎ উত্তেজিত হওয়ার ফলে অনেককে বিকৃত মস্তিষ্ক, এমন কি মৃত্যুমুখে পতিত হইতে

পর্য্যন্ত দেখা যায়।

উত্তেজনা এক প্রকার উৎকট ব্যাধি। উত্তেজনাপ্রবণ স্বভাব যাহাদের তাহারা অনেক সময় অকারণেও অমূলক সংশয় সন্দেহবশে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া পড়ে, যাহার ফল অত্যন্ত মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং অঙ্কুরেই ইহার বিনাশ সাধন একান্ত প্রয়োজন। ধৈর্য্যের সাধনা, ভগবৎচরণে ব্যাকুল প্রার্থনা ও মহতের সঙ্গ—এই ব্যাধির মহৌষধি, 'সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্'।

আমরা অনেকেই অনেক কথা জানি বলিয়া গর্ব বোধ করি; কিন্তু কেহই জানা কথাও পালন না করিবার জন্য দুঃখ অনুভব করি না। ইহা অপেক্ষা চরম দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে।

শুধু বড় বড় বা ভাল ভাল কথা জানিলেই মানুষ বড় বা ভাল হয় না। মানুষ বড় ও ভাল হয় জানা কথা ও উপদেশ পালন করিবার ভিতর দিয়া। সুতরাং এই সত্য কথাটি তথাকথিত বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও ধর্মাভিমানীর দল যত শীঘ্র বুঝিবেন ততই মঙ্গল। পরোপদেশে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন অপেক্ষা নিজের উপদেশ নিজে পালন করিলে লাভ হয় অনেক বেশী। এই লাভ শুধু নিজেরই নয়, অপরেরও। কারণ, কথার চেয়ে আদর্শ অপরের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে।

আমরা জানি অনেক, কিন্তু বুঝি কম। আবার যতটুকু বুঝি তাহাও পালন করি না এবং যতটুকু বা দাগা বুলাইবার মত পালন করিয়া যাই তাহার ভিতর দিয়াও অনুভূতি লাভের জন্য চেষ্টা করি না। ফলে সমস্ত জানা বুঝা কথা ও কাজ ব্যর্থ হইয়া অভিমানের বোঝা কেবলই ভারী হইতে থাকে। কিন্তু ইহা বুঝাইয়া দিবে কে? এই জন্যই প্রয়োজন মহতের সঙ্গ এবং সদ্গুরুর

আশ্রয়, কৃপা করুণা ও আশীর্বাদ।

কোপন স্বভাব, উগ্র মেজাজ, কর্কশ বাক্য ও দুর্বিনীত ব্যবহার মানুষকে ধীরে ধীরে একেবারে অমানুষ করিয়া ফেলে। সূচনাতেই সাবধান না হইলে প্রথমে অপ্রিয় এবং পরে সর্বসাধারণ কর্তৃক সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে থাকে। ইহাতেও যদি আত্মচেতনা ফিরিয়া না আসে তবে সমাজ পরিবার ও কর্মক্ষেত্র হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিয়া তাহাকে নানা প্রকার দুঃখ দুর্দশার মধ্যে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে হয়।

* * *

কথায় কথায় যে ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হয়, কারণে অকারণে যে হঠাৎ ক্রোধান্ধ হইয়া হিতাহিত বিবেচনা ও লঘুগুরু জ্ঞান হারাইয়া ফেলে তাহার পরিণাম বড় ভয়াবহ। অবিলম্বে আত্মশোধনে প্রবৃত্ত না হইলে বিকৃতমস্তিষ্ক হইবার সম্ভাবনাও থাকে।

* * *

বিদ্বেষ বা উত্তেজনার যত কারণই ঘটুক না কেন, ধীর স্থির শান্তভাবে তাহার প্রতিকার ও প্রতিরোধের চেষ্টা করিতে হইবে। চঞ্চল, বিক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত মন দ্বারা কখনও কোন জটিল সমস্যার সমাধান বা কোন পবিত্র কর্তব্য পালন সম্ভব নয়। শান্ত সংযত সুস্থ ও পবিত্র মনই কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ পূর্বক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত। সুতরাং এই বিষয়ে প্রত্যেককে অবহিত হইতে হইবে।

রিপু-ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় উৎপীড়িত, কামনা বাসনার জ্বালায় জর্জরিত, অশান্ত অস্থির মন ক্রমশঃ দুর্বল পঙ্গু ও অকর্মণ্য হইয়া

পড়ে, আর রিপু-ইন্দ্রিয়জয়ী শান্ত সরল পবিত্র কর্তব্য-সচেতন মন সঙ্কল্পবলে বলীয়ান হইয়া অসাধ্য সাধনে সমর্থ হয়।

*

যাহার নাম শুনিলেই তোমার অন্তরে জ্বালার সৃষ্টি হয়, যাহার বিদ্বেষ, অন্যায় ব্যবহার ও আচরণ তোমাকে বিদ্বিষ্ট করিয়া তোলে, (নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইলেও) তাহার গুণগুলি সময় সময় চিন্তা করিও। তাহা হইলে কোন প্রকার আক্রোশ চরিতার্থ বা বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া নয়, তাহার অন্যায় আচরণ, ক্ষতিকর কার্য ও প্রচেষ্টার প্রতিকার ও প্রতিনিবৃত্তির জন্যই তুমি নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে অগ্রসর হইতে পারিবে এবং ভগবানের আশীর্বাদে তোমার এই প্রচেষ্টা সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হইবে, অথচ তোমার নিজের মানসিক বিপর্য্যয় বা অন্য কোন প্রকার অকল্যাণ হইবে না।

* *

যখনই মন কোন কারণে উৎক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত বা উত্তেজিত হইবে তখনই উত্তেজনার স্থান ও কারণ হইতে দূরে সরিয়া যাইয়া মনকে ভগবচ্চিন্তায় নিবিষ্ট রাখিবে এবং প্রতিদিন নিয়মিতভাবে নির্দ্দিষ্ট সময় ভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাইবে যাহাতে দোষত্রুটি দুর্বলতাগুলি ধীরে ধীরে বিদূরিত হয়। মনকে উচ্চ আদর্শের চিন্তায় ও তাহা রূপায়ণের সাধনায় নিযুক্ত রাখিতে হইবে। সৎসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সদালোচনা ও একটা সৎ পরিবেশের মধ্যে কিছু সময় অতিবাহিত করিলে মনের সৎ প্রবণতা বৃদ্ধি পাইবে। মহৎ আদর্শ সাধনার উৎসাহ, প্রেরণা ও শক্তি যাহা হইতে পাওয়া যায় তাহাই প্রকৃত সৎসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থ, সদালোচনা ও সৎপরিবেশ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস যাহার পদে পদে এ জগতে তাহাপেক্ষা অসুখী বা কৃপার পাত্র আর কে হইতে পারে ?

*

এই সন্দেহ-সংশয় উভয়তঃ। এক দিকে মানুষ যেমন অপরের প্রতি সন্দেহ সংশয় পোষণ করে, অপর দিকে সে-ও তেমনি ভাবে যে, অন্য সকলেও বুঝি কেবল তাহাকেই সন্দেহ করিতেছে। এই প্রকার অমূলক সন্দেহ সংশয়ের ফলে মানুষের জীবনে এক দিন চরম বিপদ নামিয়া আসে যাহা হইতে সে আর কোন ক্রমেই আত্মরক্ষা করিতে পারে না।

*

সন্দেহবাতিকতা আপন জনকে পর ও সংশ্লিষ্ট অপর সকলকে শত্রু করিয়া পরিবারে ও প্রতিষ্ঠানে ভাঙ্গন ধরায় এবং সর্বত্র একটা অশান্তি উপদ্রব সৃষ্টি করিয়া পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকেও বিষাক্ত করিয়া তোলে। ইহাতে মানুষ যে নিজেই শুধু অন্তর্জ্বালায় জ্বলিয়া মরে তাহা নহে, অপরের অন্তরেও জ্বালার সৃষ্টি করিয়া তাহাকে পুড়াইয়া মারে। ফলে সে একটা বিভীষিকায় পরিণত হইয়া সর্বসাধারণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়।

*

সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি কখনও অমৃতকে গরল বোধে পরিহার করিয়া নিজেকে পরম কল্যাণ হইতে বঞ্চিত করে, আবার কখনও বা গরলকেই অমৃতবোধে আকণ্ঠ পান করিয়া মৃত্যুকে অকারণে (নিজের অজ্ঞাতে) বরণ করিয়া লয়।

সন্দেহবাতিকতা এক প্রকার মারাত্মক ব্যাধি। একবার ইহার

কবলে পড়িলে কিছুতেই আর নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। ঘুণের মত ইহা মানুষের অন্তরকে ধীরে ধীরে একেবারে অন্তঃসারহীন অকর্মণ্য করিয়া ফেলে। শুধু তাহাই নহে, ইহা মানুষের শান্তি ও কল্যাণ বিঘ্নিত করে, উন্নতি অভ্যুদয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া জীবনকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া দেয়। সুতরাং এই বিষবৃক্ষকে অঙ্কুরেই সর্বপ্রযত্নে বিনষ্ট করিতে হইবে।

* * *

শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস নিষ্ঠা ও অনুরাগ ধর্মজীবনের মূল ভিত্তি। সন্দেহ সংশয় অবিশ্বাস এই মূল ভিত্তিতে ফাটল ধরাইয়া সাধন-জীবনকে বিপন্ন করে। মানুষ কখনও কখনও এতই আত্মবিমূঢ় হইয়া পড়ে যে, জীবনের একমাত্র পথ-প্রদর্শক ও পরিচালক, বিপদাপদে একমাত্র সহায়ক ও রক্ষক, দুর্দিন ও দুঃসময়ের একমাত্র দরদী বন্ধু হিতৈষী ও আপনার জন—গুরুকে পর্য্যন্ত নিতান্ত অকারণে আঘাত দিয়া, নানা দোষে দোষী সাব্যস্ত করিয়া মনের দুঃখে কাঁদিয়া মরে। কিন্তু এমনি দুর্দৈব বা দুরদৃষ্ট যে, একবারও মনে হয় না—দোষ গুরুর নয় দোষ আমার, ভ্রান্ত তিনি নন ভ্রান্ত আমি নিজে, আমার আত্মাভিমান, আমার দৃপ্ত অহং অভ্রান্ত গুরুর উপর ভ্রান্তি আরোপ করিয়া আমাকে শুধু বিপদের মধ্যেই ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে, আমি ভ্রান্তি হইতে ক্রমশঃ অধিকতর ভ্রান্তি, মোহ হইতে ক্রমশঃ গভীরতম মোহাবর্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে দিশাহারা হইতেছি।

এখন এই দুরবস্থার প্রতিকার—এই মহাব্যাধির মহৌষধ কী? প্রতিকার বা মহৌষধ—'সতাং সঙ্গঃ'—সৎ পুরুষের সঙ্গ। কিভাবে ইহা লাভ করা যায়? 'মহৎ কৃপয়ৈব'—একমাত্র মহতের কৃপায়। এই মহতের কৃপা অতি দুর্লভ, কিন্তু অমোঘ, অব্যর্থ। ক্ষণকালের জন্যও যদি এই সুদুর্লভ বস্তু লাভ করা সম্ভব হয় তবে ইহাই মানুষকে

জন্ম-জন্মান্তরের দম্ভ, অভিমান, পাপতাপ, ভ্রমভ্রান্তি আবিলতা পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত করিয়া এই দুস্তর ভবার্ণব পার করিয়া দেয়। "ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা।"

গভীর রাত্রিতে—সমস্ত বিশ্ব যখন সুপ্তিমগ্ন তখন অতি সন্তর্পণে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ কর। যেখানে যত পাপ তাপ মলিনতা আত্মগোপন করিয়া আছে তাহাদের বাহির করিয়া আনিয়া ভগবচ্চরণে বলি প্রদান কর। আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়া অনুতাপের অনলে আত্মদহন করিয়া প্রার্থনা জানাও— হে প্রাণারাম প্রভো! আমি তোমার অবোধ সন্তান, আমার অজ্ঞান জনিত সমস্ত অপরাধ, সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি-দুর্ব্বলতা ক্ষমা করিয়া তোমার শ্রীচরণে স্থান দাও। তোমার ও আমার মাঝে যে আড়াল— যে ভেদ ও ব্যবধান আছে তাহা দূর করিয়া তোমার স্নেহশীতল কোলে টানিয়া লও। হে করুণানিধান! তুমি পরিণাম পরিণতি, তুমিই এই জীবন-তরণীর কাণ্ডারী। আজ এই বিপন্মুহূর্তে তুমি আসিয়া হাল ধরিয়া আমাকে বিপথ হইতে সুপথে নিয়া চল। হে অন্তর্দেবতা, হে হৃদয়-স্বামিন্! তোমার অহৈতুকী কৃপা করুণা ও আশীর্ব্বাদে এই দীন হীন অকিঞ্চনকে কৃতার্থ কর।

এমনি ভাবের কাতর প্রার্থনায় ভগবানের আসন টলিলে তাঁহার শুভদৃষ্টি মহতের মাধ্যমে তোমাকে অভিসিঞ্চিত করিবে এবং তুমি ধন্য ও কৃতার্থ হইবে।

—:•:—

ভ্রান্তির নেশা

আষাঢ়ের মেঘ-মেদুর সন্ধ্যা। সারাদিন অবিশ্রাম বর্ষণের পর ক্লান্ত মেঘগুলি সবেমাত্র বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছে। কতক কতক সান্ধ্য-সমীরণে ভর করিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দিনান্তের ম্লান রবি ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারিয়া যবনিকান্তরালে লুকাইবার উপক্রম করিতেছে, গোধূলির স্নিগ্ধ রক্তিমরাগ সিক্ত বিশ্বের বুকে পড়িয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছে। এমনি সময় সারাদিনের অসাড় অচল হাত-পাগুলিকে একটু সচল করিবার উদ্দেশ্যে আশ্রম-চত্বরে নামিয়া আসিলাম।

দ্বিতল আশ্রম বাটির সম্মুখে প্রাচীরঘেরা ক্ষুদ্র চত্বর, চত্বরের চারিপাশে সারি সারি রকম-বেরকমের ফুল ও রং-বেরংএর পাতাবাহারের গাছ। বর্ষার বর্ষণে গাছগুলি বেশ সতেজ হইয়া উঠিয়াছে, আর কোমল শষ্পাবৃত আশ্রম-প্রাঙ্গনটি ঠিক যেন একখানি সবুজ কার্পেটের মত দেখা যাইতেছে। কলিকাতা মহানগরীর বুকে পোড়া ইটমাটির ইমারত অট্টালিকার মাঝে প্রকৃতি যেন বর্ষা-সন্ধ্যায় তার শ্যাম অঞ্চলের সবখানি সৌন্দর্য্য এই ক্ষুদ্র বাগানে ঢালিয়া দিয়াছে। তাই জড়-সভ্যতার কৃত্রিম আব্‌হাওয়ার বাহিরে নগ্না প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সুষমা দেখিতে দেখিতে ভাবুক হৃদয় আমার অতি সহজেই গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গেল—আমি ভাববিহ্বলচিত্তে—আশ্রম-প্রাঙ্গনে পায়চারী করিতে লাগিলাম।

কত সময় এমনিভাবে কাটিল জানি না; কিন্তু হঠাৎ একটি পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ছটফটানি আমার চিন্তায় বাধা দিল; তাকাইয়া দেখিলাম, বাগানের পশ্চিমদিকের পাচিল ঘেসিয়া কতকগুলি স্তুপীকৃত ইটের উপর একটি ক্ষুদ্র পিঞ্জরে আবদ্ধ শালিকশিশু মুক্তির চেষ্টায় ছুটাছুটি

করিতেছে। শাবকটি একবার খাচাটির উত্তরে দক্ষিণে এবং একবার উপরের দিকে, এমনি করিয়া বারবার অনবরত ছুটিতেছে। কিছু সময় ছুটাছুটির পর হয়তো শ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যেই দ্বিগুণ উৎসাহে ডানা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া আবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মুক্তির মাতাল নেশা আজ তাকে মাতাইয়া তুলিয়াছে, তাই সে শ্রান্তি ক্লান্তি অবসাদ ব্যর্থতা ভুলিয়া মরিয়া হইয়া কেবলি ছুটিতেছে।

মনে পড়িল, ধর্ম্মজীবনের নবানুরাগ, বৈরাগ্যোন্মেষের সেই প্রথম দিনের কথা। পিতা মাতা, ভাই বন্ধু, আত্মীয় স্বজনের স্নেহময় আবেষ্টনের মাঝে প্রাণ মন সেদিন কিভাবে হাপাইয়া উঠিয়াছিল, কিভাবেই না সংসারবদ্ধ মন বৈরাগ্যের নেশায় পাগল হইয়া শিকল কাটিবার জন্য কেবলই সুযোগ খুঁজিতেছিল! মুক্তির জন্য সে কি তীব্র ছট্‌ফটানি, বাঁধন কাটিবার জন্য কী উদগ্র আগ্রহ! মুহূর্ত্তের তরেও শান্তি স্বস্তি নাই, কে যেন গলা টিপিয়া ধরে, শ্বাস রোধ হইয়া আসে। স্বাধীন মুক্ত, জ্বলন্ত সূর্য্যেরমত দীপ্ত আত্মা দেহের আবরণে মায়িক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া কি যন্ত্রণায়ই না জ্বলিতেছিল—চারিদিকে বন্ধনের নিদারুণ নাগপাশ, শত বৃশ্চিক দংশনের বিষম বিষজ্বালা,—প্রানমন অস্থির ওষ্ঠাগত।

তারপর বিস্মৃত স্মৃতিপটে স্তবকে স্তবকে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল ত্যাগের পথে আনন্দ-যাত্রার শান্তিময় দিব্যস্মৃতি। সে শান্তি কি বলিয়া বুঝাইবার? জনহীন দুস্তর মরুপ্রান্তরের ক্ষুদ্র কারাপ্রকোষ্ঠে শৃঙ্খলিত ব্যক্তিকে যদি সহসা তার আত্মীয় পরিজনের মধ্যে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়, অতল সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তিকে যদি হঠাৎ পোতাশ্রয়ে তুলিয়া লওয়া হয়, তবে তার যে অবস্থা, এ-ও সেই অবস্থা। এ যে শুধু জীবন ভরিয়া প্রাণ দিয়া উপলব্ধি করিবার।

তাই বিষয়-পঙ্কিল ক্ষুদ্র সাংসারিক গণ্ডীর বাহিরে শান্তিপূর্ণ কঠোর বৈরাগ্যময় এই "স্বাধীন জীবনে স্বেচ্ছাবিহারী পাখীর বন্ধন-যন্ত্রণা বড় তীব্রভাবে বুকে বাজিল, তার সেই মুক্তির আকুতি দুর্ব্বিসহ ব্যথায় অন্তরকে পীড়িত করিয়া তুলিল—আমি ধীরে ধীরে খাঁচার নিকটে যাইয়া দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলাম।

কিন্তু কই, পাখী বাহির হয় কৈ? সে যেমনি ভাবে ছুটিতেছিল ঠিক তেমনি ভাবেই পর্য্যায়ক্রমে ছুটিতে লাগিল; উন্মুক্ত দ্বার আর তার চোখে পড়িল না। আমি অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য দূরে সরিয়া আসিলাম, সন্ধ্যার ঘনায়িত অন্ধকারে পাখীর কথা চিন্তা করিতে করিতে আবার পায়চারী করিতে লাগিলাম; কিন্তু পাখী তবুও বাহির হইতে পারিল না। তখন মনে হইল ইহারই নাম "ভ্রান্তির নেশা"।

শুধু এই ক্ষুদ্র পাখীটিকে নয়, অপরিসীম বুদ্ধিমান মানুষকেও এমনিভাবেই ভ্রান্তির নেশায় পাইয়া বসে। এমনিভাবেই সে দিগবিদিক-জ্ঞান শূন্য হইয়া যুগ যুগ ধরিয়া বিপথে ঘুরিয়া মরে। জীবনের সুপ্রশস্ত পথ সর্ব্বদা সকলের জন্য উন্মুক্ত; কিন্তু অহং-গর্ব্ব অভিমানান্ধ মানুষ তাহা দেখিতে পায় কই? আর পাইলেও জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত বিরুদ্ধ সংস্কারের প্রভাব এড়াইয়া সে-পথে চলিবার সামর্থ্য তার কোথায়? ভ্রান্ত-বুদ্ধিচালিত অদম্য উৎসাহ, উদ্যম, অফুরন্ত চেষ্টা যত্ন যে প্রতিনিয়ত ব্যর্থতার দুর্ব্বহ গ্লানি বহিয়া আবার তার কাছেই ফিরিয়া আসে! "ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্বাধীন মতবাদ ও বিবেক-বুদ্ধি" (?) যে পদে পদে বিপর্য্যস্ত হইয়া রাস্তার ধুলায় লুটাইয়া পড়ে। তবু মানবের ভ্রান্তির নেশা ছুটে কৈ?

—:০:—

ওঁ

দিনচর্য্যা

১। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিবে। ইহাতে শরীর-মন সুস্থ ও উৎফুল্ল থাকে, দৈনন্দিন কর্ত্তব্য সম্পাদনে অধিকতর সময়, শক্তি ও উৎসাহ পাওয়া যায়।

২। শরীরের অবস্থানুসারে প্রত্যেকেরই নিয়মিত ভাবে কিছু সময় ব্যায়াম (খালি হাতে বা যন্ত্রাদি সহ ব্যায়াম, আসন, ভ্রমণ, দ্রুত ভ্রমণাদি) ও পরিশ্রমজনক কাজ অবশ্য কর্ত্তব্য।

৩। প্রতিদিন রাত্রিতে শয্যা গ্রহণ ও প্রত্যূষে শয্যাত্যাগের সময় নিয়মিতভাবে ভগবচ্চিন্তা ও উপাসনা করিবে।

৪। সুবিধা হইলে সকালে সন্ধ্যায় অথবা দিনরাত্রির মধ্যে যে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময় নিয়মিতভাবে কিছুক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া ভগবদুপাসনা (ধ্যান, জপ, পূজাপ্রার্থনা, সন্ধ্যাবন্দনাদি) করা একান্ত আবশ্যক।

ইহাতে বুদ্ধি নির্ম্মল ও প্রখর, দেহমন পবিত্র ও সবল হয় এবং মনের দৃঢ়তা ও একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়।

৫। প্রতিদিন কিছু সময় (অন্ততঃ তিরিশ মিনিট) নিয়মিতভাবে শাস্ত্র (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, উপনিষদ, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র-গ্রন্থ) ও জীবন-গঠনের সহায়ক মহাপুরুষদের জীবনী ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিবে।

ইহাতে মন দ্বন্দ্বসংঘর্ষপূর্ণ ব্যবহারিক জগতের উর্দ্ধে মহাশান্তিময় রাজ্যে বিচরণ করিতে সমর্থ হইবে।

৬। দিনের মধ্যে কিছু সময় সৎসঙ্গ, সদালোচনা, সদনুষ্ঠান ও সৎচিন্তা করিবে।

ইহাতে সদ্ভাব, সৎসংস্কার ও সৎপ্রবণতা বৃদ্ধি এবং কুভাব, কুপ্রবৃত্তি ও কুসংস্কারাদি হ্রাস পাইবে।

৭। প্রতিদিনের কার্য্য প্রতিদিন সম্পন্ন করিবে, কোন কিছু পরবর্ত্তী দিনের জন্য ফেলিয়া রাখিবে না।

৮। কখনও কোন প্রকার নেশা বা কু-অভ্যাসের দাস হইবে না। কোন প্রকার মানসিক চঞ্চলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে কখনও প্রশ্রয় দিবে না।

৯। কখনও বৃথা সময় নষ্ট করিবে না। সর্ব্বদা সময় ও শক্তির সদ্ব্যবহার করিবে।

১০। শরীর মন দুর্বল, নিস্তেজ ও নিরুৎসাহ হয় এমন কোন চিন্তাভাবনা, কাজ বা আলোচনা কখনও করিবে না।

১১। শক্তি ও ক্ষমতার অপচয় ও অপব্যবহার করিবে না।

১২। রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে প্রতিদিনের কাজকর্ম্ম, আচরণ ব্যবহার প্রভৃতি বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দোষ-ত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থা এবং পরবর্ত্তী দিনের করণীয় কার্য্যাবলী ও তাহা সম্পাদনের উপায় সমূহ চিন্তা করিয়া স্থির করিয়া রাখিবে।

১৩। সর্ব্বপ্রকার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার ভাব দূর করিয়া শান্তভাবে থাকিতে অভ্যাস করিবে।

১৪। অন্যায় বা অনর্থক বাদবিতণ্ডা যথাসম্ভব পরিহার করিয়া চলিবে।

১৫। সকলের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে অভ্যস্ত হইবে।

১৬। অপরের উপর রাগ না করিয়া প্রয়োজন হইলে নিজের উপর রাগ করিবে, অপরের দোষ-ত্রুটি-দুর্ব্বলতার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া নিজের দোষ-ত্রুটি-দুর্ব্বলতার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। তাহা হইলেই প্রকৃত কল্যাণ হইবে।

১৭। যাহাতে রিপু-ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা, কুভাব ও কুপ্রবৃত্তি জাগ্রত হয় তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে।

১৮। যতদূর সম্ভব সংযম, শৌচ ও সদাচার পালন, নির্দ্দিষ্ট সময়ে শরীরের পুষ্টিসাধক খাদ্য পরিমাণ মত আহার, নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরিমিত নিদ্রা (খুব কমও নয় খুব বেশীও নয়), পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অনাড়ম্বর পোষাকপরিচ্ছদ ব্যবহার, সকলের সহিত হাসিমুখে সৌজন্যপূর্ণ আলাপ ও আচরণ, নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন, মানসিক স্থৈর্য্য ও সন্তোষাদি জীবন-গঠন ও দীর্ঘায়ু লাভের পক্ষে সহায়ক।

১৯। জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনে অভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে সময়ানুবর্ত্তিতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা নিতান্ত অপরিহার্য্য।

২০। ঔদ্ধত্য ও অশিষ্টতাকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করিবে। ইহারা মানুষের সদ্‌গুণরাশিই শুধু নষ্ট করে না, সৎশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হইতেও মানুষকে বঞ্চিত করে।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভাকাঙ্খী, চরিত্রোন্নয়ন ও জীবনের উৎকর্ষতা সাধনে অভিলাষী, দীর্ঘায়ু ও শান্তিকামী প্রত্যেকে উপরি উক্ত নিয়মাবলী পালন করিয়া চলিলে উপকার লাভ করিবেন। সমস্ত জীবন ধরিয়া যদি একটি মাত্র নীতি-নিয়মও অনুসরণ করিয়া চলা যায় তবে তাহাতেও যথেষ্ট শান্তি, শক্তি ও উন্নতি লাভ করা যায়।

——::——

পরিশিষ্ট
প্রার্থনার নিয়ম

সত্ত্ব-রজস্তমোগুণভেদে মানুষের মধ্যে পশুত্ব, মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব আছে। পশুত্বকে নির্জ্জিত করিয়া মনুষ্যত্বের উদ্বোধন এবং ধীরে ধীরে তাহাকে বিকশিত করিয়া দেবত্বে রূপান্তরিত করায়ই জীবনের সার্থকতা। এই জন্য মানুষমাত্রেরই সদ্‌গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণান্তে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে কিছু সময় ধ্যানজপ, পূজাপাঠ, প্রার্থনা করা নিতান্ত প্রয়োজন। তাহাতে মালিন্য, চঞ্চলতা ও চিত্তবিক্ষেপ দূর হইয়া চিত্ত ক্রমশঃ শুদ্ধ, শান্ত, স্থির ও নির্ম্মল হইবে, মন আবিলতা-পঙ্কিলতা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠামুক্ত হইয়া সবল, সতেজ ও একাগ্র হইয়া উঠিবে। তখন নির্ম্মল দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মত সদ্ভাবসমূহ ধারণা ও আয়ত্ত করা সহজ হইবে।

প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে ও সন্ধ্যাকালে নির্জ্জনে কুশাসন বা কম্বলাসন পাতিয়া তদুপরি পদ্মাসন করিয়া বসিয়া প্রথমে সদ্‌গুরু আচার্য্যের দিব্যমূর্ত্তি ধ্যান ও নামজপ করিবে। তৎপর প্রাতঃকালে "শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা" ও "গুরু-প্রণাম-মন্ত্র" পাঠপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া শান্তি পাঠান্তে "আত্ম-কল্যাণ" ও "শক্তি-প্রার্থনা"-মন্ত্র পাঠ করিবে। সন্ধ্যাকালে ধ্যানান্তে "ঈশ্বর-স্তুতি" ও "গুরু-প্রণাম-মন্ত্র" পাঠান্তে প্রার্থনা করিবে।

ছাত্রছাত্রিগণ প্রাতঃকাল ও রাত্রিতে পাঠারম্ভের সময় প্রথমে জোড়াসন করিয়া বসিয়া (বাম পায়ের উপর ডান পা রাখিয়া সম্মুখের দিকে তাকাইয়া মেরুদণ্ড সোজা করিয়া বসা) শান্তিঃ-মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক "আত্মকল্যাণ" ও "শক্তি-প্রার্থনা" পাঠ করিয়া "মনোযোগ ও

স্মৃতিশক্তি" বৃদ্ধির প্রার্থনা করিবে। ইহাতে চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত মন শান্ত, স্থির ও একাগ্র হইয়া পাঠে নিবিষ্ট হইবে এবং ধীরে ধীরে ধারণা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পাইবে। অধ্যয়নও সাধনা। কাজেই বাজে কথা না বলিয়া এইভাবে প্রার্থনান্তে নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিলে প্রার্থনার উপকারিতা উপলব্ধি করা যাইবে। এতদ্ব্যতীত, রাত্রে শুইবার সময় বিছানায় বসিয়া "আত্মকল্যাণ" ও "শক্তি-প্রার্থনার" পর "গুরু-প্রণাম-মন্ত্র" ও ঈশ্বর-স্তুতি" পাঠান্তে শয়ন করা কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত ঘুম না আসিবে সেই পর্য্যন্ত আচার্য্যের তেজোব্যঞ্জক দিব্যমূর্ত্তি চিন্তা করিবে। তাহাতে সুনিদ্রা হইবে ও দুঃস্বপ্ন দেখা বন্ধ হইয়া যাইবে। যাহাদের প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা করিবার সুযোগ হয় না তাহারা রাত্রে শুইবার সময় ও প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিবার সময় বিছানায় বসিয়াও এই প্রার্থনা করিতে পারেন। (ইহা শুধু ছাত্রছাত্রিদের পক্ষেই প্রযোয্য)।

—:০:—

প্রার্থনা

শান্তিঃ-মন্ত্র

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

সঙ্ঘ হইতে সর্ব্বসাধারণকে দীক্ষা এবং ছাত্রছাত্রীদিগকে শক্তি-সাধন-মন্ত্র ও সাধনা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এ সম্বন্ধে প্রয়োজনমত পত্রালাপ করা যাইতে পারে।

শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা

(১)

ভব-সাগর-তারণ-কারণ হে,
রবি-নন্দন-বন্ধন-খণ্ডন হে !
শরণাগত কিঙ্কর ভীতমনে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

(২)

হৃদি-কন্দর-তামস-ভাস্কর হে,
তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে,
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদভণে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

(৩)

মন-বারণ-শাসন-অঙ্কুশ হে,
নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে !
গুণগান-পরায়ণ দেবগণে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

(৪)

কুলকুণ্ডলিনী-ঘুম-ভঞ্জক হে,
হৃদি-গ্রন্থি-বিদারণ-কারক হে !
মম মানস চঞ্চল রাত্রিদিনে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

(৫)

রিপুসূদন মঙ্গল-নায়ক হে,
সুখ-শান্তি-বরাভয়-দায়ক হে !
ত্রয় তাপ হরে তব নাম গুণে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

(৬)

অভিমান-প্রভাব-বিমর্দ্দক হে,
গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে !
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তিধনে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে !!

(৭)

তব নাম সদা শুভ-সাধক হে,
পতিতাধম-মানব-পাবক হে !!
মহিমা তব গোচর শুদ্ধমনে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ।।

(৮)

জয় সদ্‌গুরু ঈশ্বর-প্রাপক হে,
ভবরোগ-বিকার-বিনাশক হে !
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ।।

:*:—

শ্রীশ্রীগুরু-প্রণাম-মন্ত্র।

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
মন্ত্র সত্যং পূজা সত্যং সত্যং দেবনিরঞ্জনঃ।
গুরোর্বাক্যং সদা সত্যং সত্যমেব পরং পদম্।।
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
পিতৃমাতৃসুহৃদ্বন্ধু বিদ্যাতীর্থানি দেবতা।
ন তুল্যং গুরুণা শীঘ্রং স্পর্শয়েৎ পরমং পদম্।।
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বর।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামুলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমুলং গুরোঃ কৃপা।।
ওঁ ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধী সাক্ষিভূতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি।।
ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব।।

—ঃ০ঃ—

আত্মকল্যাণ প্রার্থনা

ওঁ অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়, আবিরাবীর্ম এধি।।

হে পরমেশ্বর! তুমি আমাকে অসৎ হইতে সৎ-লোকে নিয়া চল, অজ্ঞানান্ধকার হইতে জ্ঞানের আলোকে লইয়া যাও, মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া অমৃত-রাজ্যে নিয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! তুমি আমার নিকট প্রকাশিত হও।

—০—

শক্তি প্রার্থনা

ওঁ তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি।
ওঁ বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি।
ওঁ বলমসি বলং ময়ি ধেহি।
ওঁ ওজোঽসি ওজঃ ময়ি ধেহি।
ওঁ সহোঽসি সহং ময়ি ধেহি।
ওঁ মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি। (যজুর্ব্বেদ)

হে পরমেশ্বর! তুমি তেজস্বরূপ, আমাকে তেজ দান কর। তুমি বীর্য্যস্বরূপ, আমাকে বীর্য্য দান কর। তুমি অনন্ত শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ, আমাকে শক্তি দান কর। তুমি অফুরন্ত ওজঃস্বরূপ, আমাকে ওজঃ দান কর। তুমি সহন-শক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি, আমাকে সহিষ্ণুতা দান কর; তুমি অন্যায়ের প্রতি ক্রোধস্বরূপ দণ্ডদাতা, আমাকে অন্যায়ের প্রতি ক্রোধ ও অন্যায় প্রতিরোধের শক্তি দাও।

মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির প্রার্থনা

ওঁ বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা,
মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্;
আবিরাবীর্ম এধি।
বেদস্য ম আণীস্থঃ; শ্রুতং মে প্রহাসীঃ।

অনেনাধীতেন অহোরাত্রান্ সন্দধামি,
ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি,
তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু।
অবতু মাম্, অবতু বক্তারমবতু বক্তারম্ ।।
ওঁ শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

হে ভগবন্ ! আমার বাক্য মনে এবং মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। (অর্থাৎ আমি যখন যাহা অধ্যয়ন করি তাহা যেন অর্থ ও তাৎপর্য্য সহ আমার মনে মুদ্রিত হইয়া যায় এবং অধ্যয়নকালে আমার মন যেন অধ্যয়ন বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে, অন্য কোন বিষয় চিন্তা না করে।) হে প্রকাশ-স্বরূপ পরমেশ্বর ! তুমি আমার নিকট আত্মপ্রকাশ কর। হে আমার বাক্য ও মন ! তোমরা উভয়ে বেদার্থ আনয়নে সমর্থ হও (বেদার্থ অনুধাবনের উপযোগী হও)। শ্রুত বিষয়সমূহ যেন আমি ভুলিয়া না যাই। এই অধ্যয়নের দ্বারা আমি দিন ও রাত্রিকে এক করিয়া দিব (অর্থাৎ এক মুহূর্ত্তও সময় নষ্ট না করিয়া সর্ব্বদা জ্ঞানার্জ্জনে নিযুক্ত থাকিব)। আমি সর্ব্বদা উত্তম ও সত্য কথা বলিব। পরমেশ্বর আমাকে রক্ষা করুন, আচার্য্যকে রক্ষা করুন। আমায় রক্ষা করুন, আচার্য্যকে রক্ষা করুন, আচার্য্যকে রক্ষা করুন।

আচার্য্য ও আমার সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ও তাপের শান্তি হউক।

—ঃ০ঃ—

ঈশ্বর স্তুতি

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ।। ৩৮

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥ ৪০

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ৪৪

(শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১১শ অধ্যায়)

—:•:—

পুস্তক সম্বন্ধে

কয়েকখানি প্রসিদ্ধ পত্রিকার অভিমত

আনন্দবাজার পত্রিকা :— ৩রা আষাঢ় ১৩৫২ ; ২৭।৬।৪৫

"ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিরা পুস্তকখানিতে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক পাইবেন।"

যুগান্তর ঃ— ৬ই শ্রাবণ, ২২৫২ ; ইং ২২।৭।৪৫

"গ্রন্থকার মানবের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত বাধাবিপত্তি, নৈরাশ্য অবসাদ আসিয়া সাধনার পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়, সেই সকল বিপদাপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার তথ্যপূর্ণ উপদেশাদি প্রদান করিয়াছেন। **ধর্ম্মপ্রাণ শান্তিকামী পাঠক এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইবেন।"**

অমৃতবাজার পত্রিকা ঃ— *'The seekers of truth will have glimpses of light in these well-conceived and thoughtful essays."* 15th July, 1945.

দেশ ঃ—গ্রন্থকার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপদেশমূলক এই পুস্তকখানিতে উচ্চ চিন্তা, ধর্ম্ম-সাধনা ও আদর্শ-নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।"

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২ ; ইং ৮।৬।৪৫

Hindusthan Standard :- Feb. 27, 1949,

"The book is particularly suited to the requirements of the times. In this book the author has pointed out the duties and ideals of human life in graceful and expressive language and in a spirit of profound sympathy.

The author has drawn our attention to those

qualities which contribute to the development of true humanity, Behind these moral instructions lie deep faith and absolute resignation to God. In these background he has imbued these dry and didactic lessons with a tone of poetic excellence. It is to be hoped that the usefulness of such a book will be appreciated".

Amrita Bazar Patrika—"It gave us great pleasure to go through the collection of essays written by a man who wields a facile pen and has a few thing of value and import to tell us." June 8, 1947

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ সমূহ

শ্রীশ্রীযুগাচার্য্য সঙ্ঘ ও উপদেশামৃত

স্বাধীন ভারতে নূতন মানুষ ও নবজাতি গঠনের বীর্য্যবাণী।

জাতি-সংগঠক ও ধর্ম্ম-সংস্থাপক আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজীর ত্যাগ-সংযম-সত্য ব্রহ্মচর্য্য ও সেবার সুমহান্ ভিত্তিতে শক্তিশালী জাতীয় জীবন-গঠন, ছাত্র ও তরুণ সমাজের নৈতিক চরিত্রোন্নয়ন, শারীরিক ও মানসিক শক্তি অর্জ্জন, মেধা, প্রতিভা, আত্মশক্তি, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্য্যাদাবোধ জাগ্রত করতঃ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্বন্ধে উদ্দীপনাপূর্ণ মহামূল্য উপদেশাবলী সম্বলিত অপূর্ব্ব গ্রন্থ।

সঙ্ঘের প্রথম জীবনের দুষ্প্রাপ্য চিত্র সংযুক্ত, প্রায় ৫ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—৬.০০ টাকা

অমৃতবাজার পত্রিকা :—ইং ৫, ১০, ১৯৪৭ :—It deserves to be widely read for its rich contents.

Hindusthan Standard :— 6th June, 1948

"This book, written in a lucid and Powerful style, carries a message to our young hopefuls of the nation, which they will do well to heed, if they want to build a new nation on the sure foundation of self-confidence and self-respect."

আনন্দবাজার পত্রিকা :—ইং ১৪, ১২, ৪৭ :—"প্রণবানন্দজীর উপদেশামৃত যেমনি শিক্ষাপ্রদ, তেমনি আচরণের দ্বারাই প্রাণবন্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে জিজ্ঞাসু পাঠক উপকৃত হইবেন।"

দেশ : ১৭ই আশ্বিন, ১৩৫৪ : "অলৌকিক তপঃশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ প্রণবানন্দজীর উপদেশগুলি পাঠ করিলে মনুষ্যত্বের বলিষ্ঠ প্রেরণা অন্তরে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, মন সর্ব্বপ্রকার দৈন্য ও দুর্ব্বলতার ঊর্দ্ধে এক সনাতন সত্যের প্রেরণা লাভ করে। এমন প্রজ্ঞানময় বাণী প্রচারের দ্বারা গ্রন্থকার বর্তমান সমাজের অশেষ কল্যাণ-সাধন করিয়াছেন। আমরা এমন পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।"

সাধন-বাণী : (পঞ্চম সংস্করণ) মূল্য—এক টাকা

দেশ : ১০ই মাঘ, ইং ২৪, ১, ৪৮ : "জাতির মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে এগুলি সাহায্য করিবে।"

আনন্দবাজার পত্রিকা : ইং ১২, ৩, ৬৮ :—"আলোচ্য গ্রন্থে প্রকৃত মনুষ্যত্ব এবং অধ্যাত্ম-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযোগী কতকগুলি উপদেশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উপদেশগুলি সুন্দর, সরল এবং অধ্যাত্ম অনুভূতির আলোকে সেগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।"

শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ স্মৃতি চয়ন মূল্য—এক টাকা

দেশ ঃ—ইঃ ১৩ই আগষ্ট, ১৯৫৫

"স্বামী আত্মানন্দ বহু শাস্ত্রবেত্তা, সুপণ্ডিত, সাধক এবং সুলেখক। ..... লেখক মহাপুরুষ স্বামী প্রণবানন্দজীর স্মৃতি চয়নের ভিতর দিয়া তাঁহার জীবন এবং জ্ঞানগর্ভ তাঁহার মধুর বচনের উজ্জ্বল চমক আমাদের মনের উপর ফেলিয়াছেন। ইহা উন্নত জীবন লাভে মনকে উদ্দীপ্ত করে এবং চিত্তবৃত্তিকে সমুন্নত করিয়া তোলে।..."

পাথেয় মূল্য—২ টাকা

দেশঃ ইং ১৩, ৮, ৫৫

"'পাথেয়' সত্য সত্যই জীবন-পথের প্রকৃষ্ট পাথেয়। জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-বয়স-মত-পথ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষের পক্ষে গ্রন্থখানি নিতান্ত অপরিহার্য্য। দৈনন্দিন জীবনে পথচলার পাথেয়-স্বরূপ জীবন-পথের পথিকমাত্রেরই ইহা সঙ্গে সঙ্গে রাখা প্রয়োজন।"

আনন্দবাজার পত্রিকাঃ তাং ১৩, ১২, ৫৩

জীবন-পথের প্রকৃতই পাথেয়। যে কোন দেশের যে কোন ধর্ম্মের যে কোন শ্রেণীর মানুষই ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-সোপানম্ মূল্য ২ টাকা

সঙ্ঘাশ্রিত নরনারীর কর্ত্তব্য মূল্য—১ টাকা

সঙ্ঘাশ্রিত নরনারী মাত্রেরই দৈনন্দিন জীবনে ইহা অবশ্য পাঠ্য ও অনুসরণীয়।

হিন্দু সমাজ সমন্বয় মূল্য—২.০০

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮

"...ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ' কি প্রাণশক্তির বলে দীর্ঘকাল ধরিয়া হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের সেবা করিয়া চলিয়াছে, তাহার শক্তির উৎস কোথায় এবং অনন্ত সমস্যার আবেষ্টনে নিরুৎসাহ না হইয়া যথার্থ মানবপ্রীতির ভিত্তিতে নির্ব্বিরোধী সমন্বয় সমাধান কিভাবে হইতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজীর সুস্পষ্ট কর্ম্মপদ্ধতির নির্দ্দেশ ইহাতে পাওয়া যায়। হিন্দুগণ ইহা অনুসরণ করিলে বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন।..."

হিন্দুসংগঠন মূল্য—এক টাকা

আনন্দবাজার পত্রিকা

"হিন্দু মিলন-মন্দির ও রক্ষিদল গঠন আন্দোলন, অনুন্নত সমাজের উন্নয়ন, লাঞ্ছিত নিপীড়িত হিন্দুজনসাধারণের রক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে আচার্য্যয়সী প্রণবানন্দের বাণী ও পত্রাবলী হিন্দু জনসাধারণের নিকট প্রেরণা ও কার্য্যশক্তির উৎসরূপে কার্য্যকরী হইয়াছিল, সে বাণীর প্রয়োজন এখনও সমভাবে বর্ত্তমান।"

শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ উপদেশ মূল্য—এক টাকা

"সুপ্ত মনুষ্যত্বের জাগরণ, লুপ্ত আত্মশক্তির পুনরুদ্বোধন এবং চরিত্রোন্নয়নের বীর্য্যপ্রদ বাণী সম্বলিত এই পুস্তিকা পাঠে সকলেরই প্রাণমন নূতন উৎসাহ-উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে।

ছাত্রছাত্রিগণের জীবন-গঠন ও স্মরণ-শক্তির উন্নতি সম্পর্কে বিশেষ উপদেশ পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে আছে।"

—:o:—